আবোল তাবোল ৭৫' বিশেষ সংখ্যা নভেম্বর ১৯৯৮

সন্দেশ

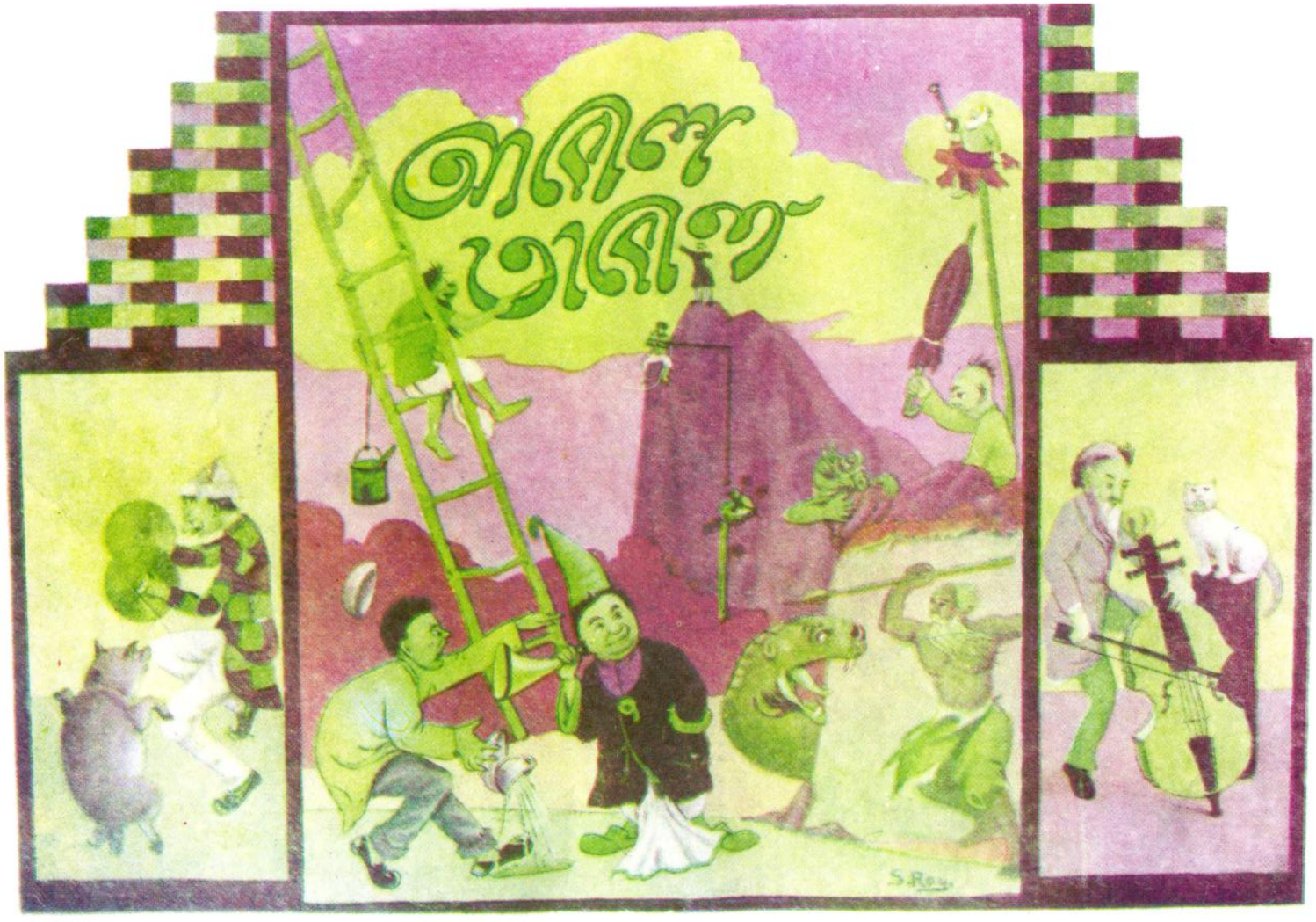

'আবোল তাবোল'এর প্রথম সংস্করণের মলাট (৫৭ পৃষ্ঠা)

যে-কোনও মাস থেকে 'সন্দেশ'-এর বার্ষিক চাঁদা: সব সংখ্যা হাতে ১২০ টাকা
শারদীয়া সংখ্যা হাতে, বাকি সব সাধারণ ডাকে ১৭০ টাকা
শারদীয়া সংখ্যা রেজিষ্ট্রি-ডাকে, বাদ বাকি সাধারণ ডাকে ১৮০ টাকা
কলকাতায় সব সংখ্যা কুরিয়ারে ১৭০টাকা
হাওড়া, সল্ট লেক ইত্যাদি অঞ্চলে কুরিয়ারে ১৮০টাকা
সব সংখ্যা রেজিষ্ট্রি-ডাকে ২৮০ টাকা। বিদেশে বিমান-ডাকে ৩৫ ডলার

প্রতি বাংলা মাসের মাঝামাঝি, ইংরাজি মাসের প্রথমে 'সন্দেশ' প্রকাশিত হয় এবং ডাকে পাঠানো হয়।
নির্ধারিত তারিখের দু মাসের মধ্যে গ্রাহকরা পত্রিকা না পেলে লিখিত নালিশ জানালে ডুপ্লিকেট দেওয়া হয়।
সন্দেশ-এর চাঁদা মানি অর্ডারে, কলকাতার চেকে অথবা ড্রাফ্‌টে পাঠানো যায়। **Sandesh** নামে চেক লিখবেন।
গ্রাহক-গ্রাহিকারা চিঠিপত্র, প্রতিযোগিতা ও হাত পাকাবার আসরে লেখা, ছবি ইত্যাদি পাঠাবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম, ঠিকানা ও বয়স স্পষ্ট করে লিখবে।
সন্দেশ ডাকে বা কুরিয়ারে পাঠাবার সময় নামের বাঁ পাশে গ্রাহক নম্বর লেখা থাকে।
লেখকের স্বনামাঙ্কিত পোস্টকার্ড দিলে ফলাফল জানানো হবে। উপযুক্ত টিকিটসহ খাম না দিলে অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোন্ মাসে লেখা পাঠানো হয়েছিল সঠিকভাবে না জানালে ফলাফল জানানো সম্ভব নয়। ১৪০৬/১৯৯৯ সালের শারদীয়া সংখ্যার জন্য লেখা মার্চের মধ্যে জমা দিতে হবে।

সন্দেশ কার্যালয়: ১৭২/৩, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০ ০২৯। ফোন: ৪৬৬-৪৯১৯
নিউ স্ক্রিপ্ট-এর দোকান: এ ১৪, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা ৭০০ ০০৭।

প্রাপ্তিস্থান –

বামনদাস ভট্টাচার্য,
পাতিরাম বুক স্টল
কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা

প্রদীপ ব্রহ্ম
গড়িয়া *(৫,৬ নং বাস স্ট্যাণ্ড)*

ইন্টারন্যাশ্‌নাল বুক সেন্টার
নিউ দিল্লী ১৯

অভয়ন, প্রেমতলা,
শিলচর,আসাম

প্রশান্ত নন্দী
গড়িয়াহাট বিপণি,
গড়িয়াহাট মোড়,
কলিকাতা

সুশীল দত্ত
শ্যামবাজার, কলিকাতা

অচ্যুত চক্রবর্তী,
রেস্ট ক্যাম্প,
গৌহাটী, আসাম

বাবলু পাত্র,
পাত্র বুক স্টল, কলিকাতা

শ্যামল ভট্টাচার্য
মহাত্মা গান্ধী রোড,
(টেমার লেনের মুখে)
কলিকাতা

শুভব্রত চক্রবর্তী
থ্রী 'এস' বুক কোম্পানী
৩৬৩, বিবেকানন্দ রোড,
বৈকুণ্ঠপুর, পোঃ রাজপুর,
পিন - ৭৪৩৩৫৮

অবনী দেয়াসী,
হাজরা মোড়, কলিকাতা

সরস্বতী বুক ডিপো
নিউ দিল্লী ১

দেব স্টোর
আগরতলা, ত্রিপুরা

কিতাব ঘর
নিউ দিল্লী ১

১৩২০/১৯১৩ সালে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত

ছোটদের সেরা মাসিক পত্র

তৃতীয় পর্যায়। বর্ষ ৩৮। সংখ্যা ৭। কার্তিক ১৪০৫। নভেম্বর ১৯৯৮

'আবোল তাবোল ৭৫' বিশেষ সংখ্যা

আবোল তাবোল। রেবন্ত গোস্বামী। ৫

দাদা সুকুমার রায়। মাধুরীলতা মহলানবিশ। ৬

হুঁকোমুখো হ্যাংলা। নবনীতা দেব সেন। ১০

আমাদের মণ্ডা ক্লাব। প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ১১

ছড়া। সুকুমার রায়। ১৮

সুকুমার রায় : তথ্যচিত্রের সম্পূর্ণ ধারাভাষ্য। সত্যজিৎ রায়। ১৯

দিলীপকুমার গুপ্তকে লেখা চিঠি। জীবনানন্দ দাশ। ৪১

হেঁশোরাম হুঁশিয়ারের ডাইরি। সুকুমার রায়। ৪২

ছড়া। সুকুমার রায়। ৪৮

আবোল তাবোল এবং সুকুমার কুইজ। সুগত রায়। ৪৯

বাদুড় বিভীষিকা। কাহিনী : সত্যজিৎ রায়। ছবি : অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়। ৫০

পঁচাত্তরের পূর্তি, আজগুবিয়াস ফূর্তি। ভবানীপ্রসাদ মজুমদার। ৫৫

আবোল তাবোল : তখন আর এখন। সিদ্ধার্থ ঘোষ। ৫৬

দেওয়ালের ওপারে। দীপঙ্কর সরকার। ৬৩

ছড়া। সুকুমার রায়। ৬৫

আবোল তাবোলের গল্প। প্রসাদরঞ্জন রায়। ৬৭

'সন্দেশ'এ আবোল তাবোল। ৬৮
খসড়া। সুকুমার রায়। ৭৬
নূতন ধাঁধা। সুকুমার রায়। ৭৭
সত্যিই আবোল তাবোল?। প্রণব মুখোপাধ্যায়। ৭৮
নাকের বদলে নরুন। হিমন মুখোপাধ্যায়। ৮২
হাত পাকাবার আসর। ৮৩
কাদাস্তুয়া। বিশ্বজিৎ রায়। ৯০
হীরক রাজার দেশে (চিত্রনাট্য)। সত্যজিৎ রায়। ৯৫

প্র চ্ছ দ
সুকুমার রায়

স ম্পা দ ক
লীলা মজুমদার
বিজয়া রায়

স হ যো গী স ম্পা দ ক
সন্দীপ রায়

শি ল্প বি ভা গ
সন্দীপ রায়
শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

কালি প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড বাইণ্ডার্স, ১০৯ বি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত,
সন্দেশ কার্যালয়
১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০০২৯ থেকে অমিতানন্দ দাশ কর্তৃক প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী
সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি লিমিটেড।

সুকুমার রায়চৌধুরী, বি-এস্-সি, এফ্-আর-পি-এস্ প্রণীত

আবোল তাবোল

বাহির হইয়াছে

আয়রে ভোলা খেয়াল-খোলা
স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়,
আয়রে পাগল আবোল তাবোল
মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।
আয় যেখানে খ্যাপার গানে
নাইকো মানে নাইকো সুর।
আয়রে যেথায় উধাও হাওয়ায়
মন ভেসে যায় কোন্ সুদূর।

পাতায় পাতায় হাসি, পাতায় পাতায় মজার ছবি! সুন্দর মোটা কাগজে ছাপা, চমৎকার রঙ্গিন মলাট, মজবুত বাঁধাই। ছেলেমেয়েদের পূজার উপহারের এমন বই আর নাই।

দাম ৸৹ আনা।

সন্দেশ কার্য্যালয়, ৭২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৭৫ বছর আগের বিজ্ঞাপন (সন্দেশ। কার্তিক ১৩৩০)

সন্দেশ

'আবোল তাবোল ৭৫'

কার্তিক ১৪০৫ বিশেষ সংখ্যা নভেম্বর ১৯৯৮

রেবন্ত গোস্বামী

আবোল তাবোল

সেই কবেকার এক সুকুমার
বাঁধলো তোড়ায় ঘোড়ার ডিম,
আজগুবি তার সুরের বাহার
ভাঙছে আজও মনের ঝিম।

ভাবতে অবাক, মাঝখানে ফাঁক
বছর গোটা পঁচাত্তর—
তাও কী তাজা, খেয়াল-খাজা
টাটকা ভাজা এ'মাত্তর!

হয়তো আনে অন্য মানে
সেই কবিতা সেই কথা—
সেই খিচুড়ি, সে গোঁফচুরি
এই যুগেতেও নেই কোথা?

থাক যেখানে অন্য মানে—
সেই ব্যাকরণ মানব না।
শুনব কেবল আবোল তাবোল
ছন্দে রসের জাল বোনা।

পৌনে শতক তার সে চটক
বাড়িয়ে চলে দিনকে দিন,
দেয় মনে দোল আবোল তাবোল
বাজিয়ে সে বোল ধিনতা ধিন।

উধাও হাওয়ায় মনটা ভাসায়
আজগুবি আনন্দেতে—
পঁচাত্তরেও মাতায় ঘোরে
অসম্ভবের ছন্দেতে!

দাদা সুকুমার রায়

মাধুরীলতা মহলানবিশ

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর অনুজ কুলদারঞ্জন রায়ের কন্যা মাধুরীলতা রায়ের জন্ম ১৯০১-এ। সুকুমার রায়ের এই খুড়তুতো বোন একান্নবর্তী রায়-পরিবারে বিবাহকাল পর্যন্ত ছিলেন। মাধুরী দেবীর বিবাহ হয় সুকুমার রায়ের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের কনিষ্ঠ ভাই প্রফুল্লচন্দ্র বা বুলা মহলানবিশের সঙ্গে।

সেই বাইশ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে জ্ঞান হওয়া অবধি দাদাকে, মানে সুকুমার রায়কে দেখে আসছি। তারপর ১৯২৩-এ গড়পারের বাড়িতে দাদা যখন চিরকালের মতো চলে গেলেন তখন আমার বয়স বাইশ বছর।

বাড়িতে আমরা অনেকগুলি ভাইবোনের বড়দি সুখলতা,তারপর পুণ্যলতা, শান্তিলতা, আমি, আমার বোন তুতু ছিল; দাদা ছাড়া সুবিনয়, সুবিমল আর আমার নিজের ভাই করুণারঞ্জন। আমরা খুব ছোটবেলায় দেখতাম সকালবেলায় এক মেমসাহেব আসতেন। তিনি পিয়ানো ও গান শেখাতেন। দাদা বলতেন, 'ও সব আমার ভালো লাগে না। ছবি আঁকো, গান করো, এটা করো, সেটা করো। যতসব ড্রয়িং-রুম অ্যাকমপ্লিশমেন্ট। আমরা বরং সন্ধ্যাবেলা নাটক করব।'

আরেকটা নিয়ম দাদার পছন্দ ছিল না সেটা এখানে বলেই নিই। জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান বা গোঁড়া ব্রাহ্ম। রোজ খেতে বসার আগে প্রার্থনা করতে হত আমাদের। দাদা হয়ত মুখে গ্রাস তুলতে যাবেন, পাশের ঘর থেকে জ্যাঠামশাই বলতেন, 'মন্ত্র পড়ে তারপর খাওয়া শুরু হবে।' দাদা বলতেন, 'ধ্যাৎ, এসব একদম ভালো লাগে না। কেন যে বাবা এগুলো করেন বুঝতে পারি না। খাওয়ার আগে কোনো কিছু পড়ব না, ভগবানকে ডাকব না।' আমাদেরই বলতেন এসব কথা।

জ্যাঠামশাইয়ের গোঁড়ামির কথা যখন উঠল তখন আরেকটা ঘটনা বলে নিই। একবার বাবা লক্ষ্ণৌ না লাহোর কোথায় ক্রিকেট খেলতে গেলেন, সেখান থেকে আমাদের জন্য জরির নাগরা জুতো নিয়ে এলেন। জ্যাঠামশাই দেখেই বললেন, 'এসব কি? এগুলো কাদের জন্য?' যেই শুনলেন আমাদের সকলের জন্য আনা হয়েছে অমনি বললেন, 'না না, এসব পরতে হবে না। এগুলো বাইজিরা পরে। এসব ফেলে দাও। ঝুড়িসুদ্ধু ফেলে দিয়ে এসো।' আমাদের কী মন খারাপ যে হয়েছিল। দুঃখে মরে যাই আর কী! জ্যাঠামশাই যেমন গোঁড়া ছিলেন, দাদা একেবারেই তা ছিলেন না। যাই হোক, তা সন্ধেবেলার সেই নাটক সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়ির উপরের প্রকাণ্ড হলঘরে খুব জমত। সব জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাইবোনেরা আসতেন – হিতেন বোস, অশীন বোস, শৈলজারঞ্জন, হৈমজারঞ্জন। ময়না, মালতী আমরা সব ছোট ছোট গুড়ি গুড়ি মেয়েরা বসে, আর সবাই দাঁড়িয়ে। প্রকাণ্ড এক বিছানার চাদর মুড়ি দিয়ে লাইন করে আঠারোজন দাঁড়ালেন। দাদা বললেন, 'সব স্তোত্র পড়। স্বর্গে যাবার মন্ত্র পড়।' অমনি তালে তালে বলা হল,

হলদে সবুজ ওরাং ওটাং
ইঁটপাটকেল চিৎপটাং।

গন্ধগোকুল হিজিবিজি
নো অ্যাডমিশন ভেরি বিজি
নদী ভৃঙ্গী সারেগামা
নেই মামা তাই কানা মামা
মুশকিল আশান উড়ে মালি
ধর্মতলায় কর্মখালি
চিনেবাদাম সর্দিকাশি
ব্লটিংপেপার বাঘের মাসি।

হঠাৎ সেই চাদরের মধ্যে থেকে দাদা বলে উঠলেন, 'এই রে,উল্টোদিকে নেমে যাচ্ছি। স্বর্গে যাচ্ছি না,নেমে যাচ্ছি পাতালে। ভুল হল। ভুল মন্ত্র। আরেকটা পড়।' তখন আবার,

ভাব একে ভাব, ভাব দুগুণে ধোঁয়া,
তিন ভাবে ডিসপেপশিয়া—ঢেকুর উঠবে চোঁয়া
চারভাবে চতুর্ভুজ ভাবের গাছে চড়—
পাঁচ ভাবে পঞ্চত্ব পাও, গাছের থেকে পড়।...

তারপর এ ওর ঘাড়ে গুঁতো দিয়ে, ধাক্কা লাগিয়ে সব গড়াগড়ি যেতে লাগলেন। আমাদের খুব মজা লাগত।

ছাদের সেই ঘরে দাদার যে কত দুষ্টুমি ছিল। মেজদি পুণ্যলতার তখন বিয়ে হবে। ছাদেই একটা টিনের ছাদওলা রান্নাঘর মতো ছিল। সেখানে বসে মেজদি তার ভাবী বরকে চিঠি লিখছে। একটা ভাঙা টেলিস্কোপ চোখে লাগিয়ে দাদা সেখানে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে যেতে লাগল, 'প্রিয়তম, তুমি কবে আসিবে' এই সব। আর মেজদির চিৎকার, 'দাদা, দাদা, মা দেখো, দাদা যা-তা বলছে।' দাদা বললেন, 'আমি তো চারদিকের আকাশ দেখছি।' এসব ছিল দাদার মজা। নির্দোষ আনন্দ।

তারপর দাদা তো বিলেতে গেলেন। আমরা তখন বড় হয়েছি। দাদার চিঠি আসত। দু-বছর পরে দাদা ফিরে এলেন। দাদার বিয়ের কথা তখনই উঠল। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ এবং সুবালা আচার্যর বাড়িতে থেকে টুলুবৌদি কলেজে পড়তেন তখন; প্রাণকৃষ্ণ এবং সুবালা আচার্যর সংসারেই তিনি বড় হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে দাদার বিয়ে ঠিক হল। আমাদের বাড়িতে একদিন সেই মেয়ে সুপ্রভাকে আনা হল; কনে দেখার আসরে সুপ্রভাকে বলা হল একটা গান শোনাও। চমৎকার গান করতেন। খুবই ভালো গাইতেন। তিনি তখনও পর্যন্ত জানতেন না যে আমাদের দাদার ডাক-নাম তাতা। গান ধরলেন, 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে / তাতা থৈ-থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।' আমরা যারা তখন অল্প বয়সের, বলাবলি করছি, ঐ দেখ তাতা বলছে, আবার তাতা বলছে। নতুন বৌদি হবে তাই দাদার নাম তাতা বলছে। বৌদি তো পরে ভীষণ অপ্রস্তুত হয়েছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজ পাড়ায় বিমলাংশুপ্রকাশ রায়ের বাড়ি; দাদার সেই বন্ধুর বাড়ির ছাদে ফ্রেটারনিটি ক্লাব হল। সেখানে সব জমা হতেন, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলে আসতেন। জংলুমামাও আসতেন। একবার ঠিক হল কবিতা লেখার আসর হবে। দাদা বললেন, 'যে যা পার এখনই কবিতা লিখে আমাকে দাও।' তারপর দাদা একটা করে কাগজ খুলছেন আর পড়ছেন। একটাতে লেখা ছিল—

ভীষণ ডিগবাজি
খেতেন শিবাজী।

তলায় লেখা, প্রভাত গাঙ্গুলি। প্রভাত গাঙ্গুলি অর্থাৎ জংলুমামা তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠেছেন, 'আমি লিখিনি, আমি মোটেই লিখিনি।' নানকুদা পালিয়ে গেলেন। দাদা ধরতে পারলেন, নানকু (সুবিমল রায়) লিখেছেন। নানকুদার মধ্যেও খুব 'হিউমার' ছিল। সেই ছাদে বসে দাদার বুদ্ধিমত নানারকম খেলা হত। যেমন রবীন্দ্রনাথের একটা গানের লাইনের শেষ অক্ষর নিয়ে আরেকটি গানের শুরু করা, যেমন, 'এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না' সেখান থেকে একজন বললেন, 'না না গো না, কোরো না ভাবনা।' এরকম ভাবে লাইন লম্বা হয়ে চলত। বাইরে গিয়ে আমাদের আনন্দ পেতে হত না, ঘরে বসেই নানা রকম আমোদ পেতাম দাদার জন্য।

সমাজপাড়ায় একবার বিমলাংশুবাবুদের ছাদেই মাঘোৎসবে ব্রাহ্ম যুবকদের আলাদা উপাসনা হয়। দাদার নেতৃত্বেই সেই ঘটনাটি ঘটল। দাদারা চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সদস্যপদ দিতে, কিন্তু সমাজের যাঁরা পুরনো প্রবীণ যেমন কৃষ্ণকুমার মিত্র, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, তাঁরা রাজি হলেন না। সেই নিয়ে তো প্রবীণে আর নবীনে বিরোধ বেধে গেল। দাদার পরামর্শ আর পরিকল্পনামত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ একটি বই লিখে ছাপিয়ে বিলি করলেন, 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই?' সেবার সমাজ-মন্দিরে মাঘোৎসব উপাসনা হল, আর সে সময়েই দাদারা সব বন্ধুরা মিলে আলাদা উপাসনা করলেন। স্যার নীলরতন সরকারের মেয়ে অরুন্ধতী গান করলেন, 'নতুন জীবন তোমার হাতে একবার কর দান...।' ওখানে বৃদ্ধদের উপাসনা, এখানে তরুণদের। একদিন রামমোহন রায়ের উপর রামমোহন লাইব্রেরিতে বক্তৃতা দিয়ে দাদা বাড়ি ফিরলেন। এসেই বৌদিকে বললেন, 'টুলু, আমি বেশিদিন বাঁচব না।' বললেন, 'যখন লেকচার দিচ্ছি তখন যেন আমার ভিতর থেকে স্পিরিট বেরিয়ে গেল; আমি বুঝতে পারলাম যে সে আমারই আত্মা।' একেই বোধ হয় এখনকার সাইকোলজির ভাষায় বলে একস্ট্রাসেনসরি পারসেপশন! শুনে আমাদের খুব অদ্ভুত লাগল।

তারপর দাদা নিজের দেশ ময়মনসিংহের মসুয়াতে গেলেন। সেখানকার সবাই ডেকেছিলেন। জমিদারের 'কর' দেবেন তাঁরা। যেতে হল বাধ্য হয়েই। সেখানে যেতেই দাদাকে শুনতে হল, এই খাজনা বাকি, ওই ওদের খাজনা বাকি। তারপর অনেকে গিনি এসে পায়ের কাছে রাখল। দাদা জিগ্যেস করলেন, 'এসব কি?' 'এসব আমাদের প্রণামী।' 'এসব আমি চাই না। নিয়ে যাও এসব, সব ফিরিয়ে নাও,' বলে সব দিয়ে এলেন। বললেন, 'আমি আর আসছি না, তোমরা হিসেবমত যার যেমন কাজ করো।' সেখান থেকে চলে এলেন, আর আসবার সময় কালাজ্বর অসুখটি নিয়ে এলেন।

কলকাতায় এসে দাদার প্রায় জ্বর হত। ঐ অসুখের ওষুধ তখন তো বেরোয়নি। নানকুদা তিব্বতিবাবা নামে এক সাধুকে নিয়ে এলেন; তিনি নিমের ডাল, লাউয়ের খোলা দিয়ে অনেক কিছু চেষ্টা করলেন। কিছুতেই কিছু হল না। ভীষণ জ্বর হয়, আবার ছাড়ে। খেতে পারেন না কিছু। একেবারে বিছানায় শয্যাশায়ী। বন্ধু প্রশান্ত মহলানবিশ প্রায় রোজ আসতেন। দাদা বলতেন, 'প্রশান্ত, আমি বইটা লিখে নিই। শেষ করে নিই, তারপর যাব।' হয়ত 'আবোল-তাবোল' বইটার কথাই হত। ঐরকম অসুস্থ অবস্থাতেও কী ভাবে মাথায় আসত এতসব লেখা! বৌদি সব লেখাপত্র জোগাড় করে রাখতেন।

দাদা বিছানায় শুয়ে শুয়ে লিখতেন, ছবি আঁকতেন। মুখে বলে যেতেন, বৌদি পাশে বসে লিখে নিতেন। ছবি আঁকবার রঙ-তুলি সব বিছানার পাশে থাকত। অনেক সময় বলতেন, এই রঙ দাও, ঐ রঙ দাও। বৌদি রঙ দিতেন, আমিও রঙ দিতাম, মানে 'ফিল-আপ' করতাম। ছোট্ট ছেলে মানিক এসে বিরক্ত করত। এটা নাড়ত, ওটা ফেলত। দাদা বলতেন, 'নিয়ে যাও একে।' দাদার মুখের তলায় একটা বড় আঁচিল ছিল, মানিক সেইটা ধরে টানাটানি করত।

সায়েন্স স্কলারশিপ পেয়েছি শুনে দাদা বললেন, 'না রে তোকে দেয়নি। বানিয়ে বানিয়ে লিখে দিয়েছে।' আমি ভাবলাম, তাই বুঝি হবে। গেজেটে নাম বেরিয়েছে কিন্তু দাদার কথাই সত্যি বলে ভেবেছি। তারপর সরকারি স্কলারশিপের টাকা যখন এল, দাদাকে বললাম, 'তুমি যে বলেছিলে এসব মিথ্যে!' দাদা বললেন, 'তোকে একটু ভয় দেখালাম।' দাদার অসুখের মধ্যেই আমি বেথুন কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করলাম। আমার বিষয় ছিল বটানি, বায়োলজি ইত্যাদি। তারপর তো আর পড়া হল না, ইউনিভার্সিটিতে 'কো-এডুকেশন'—বাবা পাঠালেন না।

দাদা বিছানায় শয্যাশায়ী, বৌদি লিখতে লিখতে কখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছেন। দাদা চুপি চুপি একটা চিঠি লিখে বৌদির হাতের তলায় রেখে দিয়েছে; তাতে লেখা 'ডিয়ারেস্ট এঞ্জেল, সেই তুমি যখন ডায়োসিশনে পড়তে তখন তোমায় কতবার দেখেছি। আজ এতদিন পরে দেখা পেলাম।' এইসব কথা। অনেকক্ষণ পরে বৌদি জেগে উঠে চিঠিটা দেখছেন, 'এ কী? এটা কে দিল?' দাদা গম্ভীরভাবে বললেন, 'তা তো আমি জানি না কে দিল। জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে গিয়েছে।' বৌদি বললেন, 'কক্ষনো না, মিথ্যে কথা, কক্ষনো হতে পারে না।' দাদা বললেন, 'আমি কি কিছু বলছি, আমি তো সাক্ষী মানছি না, তুমি অমন করছে কেন।' সেই কঠিন অসুখেও রসিকতাটি ঠিক ছিল। দমে যেতেন না কিছুতেই।

শরীর খুব খারাপ যখন একদিন প্রশান্তচন্দ্রকে বললেন, 'প্রশান্ত, রবীন্দ্রনাথকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে।' রবীন্দ্রনাথ আসতেন, এসে পাশে বসতেন। তা সেই শেষ কালের খারাপ অবস্থায় বললেন, 'প্রশান্ত, তুমি রবীন্দ্রনাথকে একবার আনো।' প্রশান্তচন্দ্র গিয়ে জানালেন যে সুকুমারের খুব খারাপ অবস্থা; আপনি একবার যেতে পারবেন? রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'নিশ্চয় যাব।' রবীন্দ্রনাথ এলেন। পাশে বসতেই দাদা তাঁর কাছে গান শুনতে চাইলেন। রবীন্দ্রনাথ শোনালেন গান। তার মধ্যে একটা ছিল, 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে।' আমার স্পষ্ট মনে আছে এই গানটির কথা।

কয়েক দিন পরে ভীষণ ভূমিকম্প হল। ঘরদোর সব নড়ে উঠল। আমি দাদার পায়ের কাছে খাট ধরে দাঁড়িয়েছিলাম। এক সময়ে থেমেও গেল। কিছুক্ষণ পরে দাদা বললেন, 'এবার চলি। টুলু, প্রস্তুত হও।' এই কথাই ছিল দাদার শেষ কথা।

কুলদারঞ্জন রায়ের দুই কন্যা—ইলা ও মাধুরীলতা।
উপেন্দ্রকিশোরের তোলা ফটো

হুঁকোমুখো হ্যাংলা

নবনীতা দেবসেন

হঠাৎ সেদিন আশিন মাসে
দেশ জুড়ে এক অট্টহাসি
নৌকো মানুষ পিঁপড়ে ফানুস
সবাই হেসে গোবর গানুষ
হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে
ঝরঝরিয়ে অশ্রু ঝরে
দেশ জুড়ে সব আহ্লাদে
পাগলা হাসির পাল্লা দেয়।

হঠাৎ বেসুর বাজলো কি?
বুধ-ছানাটা আসলো কি?
গুড়্গুড়্গুড়্ গড়িয়ে হামা
ডুকরে কাঁদেন নিন্দে মামা।
'নিন্দে' তো নয় 'নন্দ' তো!
মেমরি তোর মন্দ তো?
পেরিয়ে গেছেন একশো এক
বললে সবাই 'দ্যাখ্ রে দ্যাখ!'

দৌড়ে এলেন বদ্যিমশাই—
'কী হয়েছে নন্দ গোঁসাই?'
কাঁদতে কাঁদতে নন্দ বলে—
'ফেলব এবার পটল তুলে!
কাঁদছি কেবল, থামছি নে
আর তো আমি পারছিনে!
কাঁদছি কেবল ফ্যাঁসোর ফ্যাঁস
কে ছড়ালে টিয়ার গ্যাস?

যেই পেয়েছি খবরটা
পাল্টে গেল শহরটা
ক্যান্ রে ব্যাটা ইস্টুপিট্
ঠেঙিয়ে তোদের করব টিট্
সুইডেনে সব অন্ধ?
নেই কি হেথায় নন্দ?

বুকের ভেতর ধড়্ধড়াধড়্
কানের ভেতর ফর্ফরাফর্
খাচ্ছি কিন্তু গিলছি না
কারুর সঙ্গে মিলছি না
রামগরুড়ের আসল ছানা
হাসতে আমার গুরুর মানা!

যাও তো বাপু বদ্যি
মিনিট দুয়ের মধ্যি
দাও এনে এক ওষুধ বেশ,
কান্নাকাটির ধকল শেষ।
নইলে কিন্তু রক্ষে নেই—
গিলবো কপাৎ মুহূর্তেই!'

বদ্যিমশাই ভয়ের চোটে
লুঙ্গি তুলে ঘরকে ছোটেন
গেলেন বসে পুঁথি নিয়ে।
এই পুঁথি সেই শিবের বিয়ের
কী তাতে নেই? সবই আছে
বদ্যিবাবুর পুঁথির মাঝে।

মানিকদাদার আপন বাবার
স্পেশাল দাওয়াই কান্না থামার
বিষ্টি নামাও, ভুঁড়ি কমাও
ঢাকের বাদ্য, আদ্য শ্রাদ্ধ
সাবান কালি, মেহের আলি
লুচির সাইজ, নোবেল প্রাইজ—
নেইকো কেবল সেই কেতাবে
হিংসে হলে কে ঠেকাবে!
ঐ যাঃ গেল ফস্কে প্রাইজ
হেই মামা তুই ক্ষেপলি তাই?

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

আজকাল যেমন কলিকাতার পল্লীতে পল্লীতে, এমনকি ..গ্রামাঞ্চলেও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, এই বিংশ শতকের প্রারম্ভে ... তাহার তেমন রেওয়াজ ছিল না। ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করিয়া জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে একটি এরূপ আসরের কথা শুনা যায়। সেখনে ফরাসী সাহিত্যে সুপণ্ডিত রবীন্দ্রনাথের একান্ত অনুরাগী প্রিয়নাথ সেন, সাহিত্যিক অক্ষয় চৌধুরী, রসিকপ্রবর লোকেন্দ্রনাথ পালিত প্রভৃতির নিয়মিত বৈঠক বসিত। পরে বিংশ শতকের প্রারম্ভে সাহিত্য ও শিল্পসেবী মহলে ঘরোয়া-ভাবে ... সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি পরিচালনের রেওয়াজ ধীরে ধীরে দেখা দিতে আরম্ভ করে। ...'মানসী'র বৈঠক, 'ভারতী'র বৈঠক ও গজেন্দ্রকুমার ঘোষের গৃহের বৈঠক প্রভৃতির সম্পর্কে সুসাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায় কিছু তথ্য পরিবশেন করিয়াছেন...। কিন্তু আমাদের কৈশোরকালের সুপ্রসিদ্ধ শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায়ের চেষ্টায় স্থাপিত 'ননসেন্স ক্লাব' ও 'মনডে ক্লাব' সম্পর্কে তেমন কোনও পরিচয় এ পর্যন্ত বাহির হয় নাই ...।

এই মনডে ক্লাব প্রকৃতপক্ষে সুকুমার রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ননসেন্স ক্লাবরেই বর্ধিত রূপ। রায় পরিবারের লোকজন ও পরিবারের নিকট আত্মীয়গণকে লইয়াই ঘরোয়াভাবে সুকুমার ননসেন্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার নিয়মিত বৈঠক বসিত সুকুমার রায়ের বাড়ি বাইশ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটে। নানারূপ আলোচনা, সংগীতের আসর, ক্লাবের জন্য রচিত সুকুমার রায়ের ব্যঙ্গ নাটকের অভিনয়, হস্তলিখিত সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা' প্রকাশ, প্রভৃতি এই ক্লাবের কার্যপ্রণালীর অঙ্গীভূত ছিল।

এই ক্লাবের সদস্যগণ যে অভিনয় করিতেন তা আত্মীয়স্বজনের সম্মুখে অভিনীত হইত। 'ঝালাপালা', 'অবাক জলপান', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'চলচিত্তচঞ্চরী', 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম' ব্যতীত সুকুমারের পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায় রচিত 'কেনারাম ও বেচারাম'।... সুকুমারের ক্লাবের জন্য নতুন নাটক 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'য় প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাগুলি সুকুমারের সহধর্মিনী অতি যত্ন সহকারে রাখিয়াছিলেন বলিয়া এগুলি বিলুপ্ত হইতে পারে নাই।...

উদ্ভট নাম দেন সুকুমার রায়

ক্লাবের প্রতিটি সদস্যেরই এক একটা উদ্ভট নাম দিতেন

স্বয়ং সুকুমার রায়। উদাহরণস্বরূপ— 'মঙ্গলা মাসোরার গ্যোচ্ছো', 'জাপানর্মা সাবানসোর', 'ম্লাইফক্স মেটেহেন', 'মাখনলাল ভজুয়া' প্রভৃতি। এই সমস্ত নামকরণের পশ্চাতে এমন কারণ সব ছিল যে সকলেই নামগুলোকে খুব সুপ্রযুক্ত মনে করিতেন। সম্ভবত পত্রিকার ফাইল সুকুমারের পুত্র সত্যজিৎ রায়ের নিকট এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে।

'অনুপ্রাসের অনুক্রম'

সুকুমার 'শ্রীশ্রীবর্ণমালাতত্ত্ব' নামে অনুপ্রাসের খেলায় কবিতা রচনাতে প্রথম থেকে শেষ অক্ষর পর্যন্ত এরূপ অনুপ্রাসের খেলা খেলিতে ইচ্ছা ছিল। ...সুকুমারের এই পদ্যে অনুপ্রাসের ছটা সম্পূর্ণ হইলে যে কি অনবদ্য রচনা হইত তাহার সামান্য পরিচয়ের জন্য তিনি যতটুকু পদ সমাপ্ত করিতে পারিয়াছিলেন তাহার কিছু কিছু তুলিয়া দিতেছি। যেমন 'ঙ' সইয়া রচনা অত্যন্ত কঠিন। সুকুমার লিখিয়াছেন—

বিকল অঙ্গ, ভগ্ন জঙ্গ, এ কোন
পঙ্গু মুনি?
কেন ভাঙা ঠ্যাঙে ডাঙায় নামিল
বাঙলা মুলুকে শনি?
রাঙা আঁখি জ্বলে, চাঙা হয়ে বলে,
ডিঙাব সাগর গিরি,
কেন ঢঙ ধরি, ব্যাঙাচির মতো
লাঙুল জুড়িয়া ফিরি।'

আর একটি সম্পূর্ণ অংশ 'ক বর্গ' হইতে তুলিয়া দিলে পরে এই রচনাটি কত অনবদ্য ও কত উচ্চ শ্রেণীর হইয়াছিল, ভাষার উপর সুকুমারের কিরূপ দখল ছিল, সে সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত হবে—

'আয় নেমে আয় কণ্ঠ বর্গে
কাকুতি করিছে সবে,
আয় নেমে আয় কর্কশ ডাকে
প্রভাত কাকের রবে।
নমো নমো নমো সৃষ্টি প্রথম
কারণ জলধি জলে
স্বল্প তিমি'র প্রথম কাকলি
প্রথম কৌতূহলে,
আদিম তামসে প্রথম বর্ণ
কনক কিরণমালা,
প্রথম ক্ষুধিত বিশ্বজঠরে
প্রথম প্রশ্ন জ্বালা।
কহে কই কোনো কোথায় কবে গো
কেন বা কাহারে ডাকি?
কহে কহ কহ কেন অহরহ
কালের কবলে থাকি?
কহে কানে কানে করুণ কূজনে
কল কল কত ভাসে,
কহে কোলাহলে, কলহ-কুহরে
কাষ্ঠ কঠোর হাসে।
কহে কটমট কথা কাটা কাটা
কে ও কেটা কহ কারে?
কাহার কদর কোকিল কণ্ঠে
কুন্দ কুসুম হারে?
কবি কল্পনে কল্পকলায়
কাহারে কচ্ছি সেবা?
কুবের কেতনে, কুঞ্জ কাননে
কাঙাল কুটিরে কেবা?
কায়দা কানুনে কর্মে কারণে
কীর্তি কলাপ মূলে
কেতাবে, কোরানে, কাগজে কলমে
কাঁদাবে কেরাণী কুলে?
কথা কাঁড়ি কাঁড়ি কত কানাকড়ি,
কাজে কচু কাঁচকলা
কভু কাছা কোছা কোর্তা কলার
কভু কৌপীন ঝোলা।
কুটিলে কৃপণে, কুৎসা কথনে,
কুলীন কন্যদায়ে
কর্মক্লান্ত কালিমাক্লান্ত ক্লিষ্টকাতর কায়ে।
কলে কৌশলে কপট কোঁদলে
কঠিনে কোমলে মিঠে
ক্লেদ কুৎসিত কুষ্ঠ কলুষ
কিলবিল কৃমি কীটে।
'ক' এর কাঁদনে কাংসক্কণনে
বস্তু চেতন জাগে,
অকাল ক্ষুধিত খাই খাই রবে
বিশ্বে তরাস লাগে।
আকাশ অবধি ঠেলিয়া জলধি
খেয়াল জেনেছে খ্যাপা।

কারে খেতে চায়, খুঁজে নাহি পায়,
দেখ কি বিষম হ্যাপা,
(খালি) কর্তালে কভু কীর্তন খোলে?
খোলে দেও চাঁটি পেটা।
নামাও আসরে ক-এর দোসরে
সেঁদালো সেঁদালো সেটা।'

... এক বর্ণ হইতে পর বর্ণে গমন ও কেমন সুকৌশলে নিপুণভাবে গ্রন্থনে সুকুমার সফল হইয়াছিলেন তাহা ভাবিতে আশ্চর্য লাগে। ... স্বরবর্ণের 'অ' হইতে আরম্ভ করিয়া ... শেষ করিয়া ব্যঞ্জনবর্ণের আরম্ভ এই প্রকার করিয়াছিলেন—

'শাস্ত্র বিধান কর প্রণিধান,
ওরে উদাসীন অন্ধ,
ব্যঞ্জন স্বরে যেন হরি হরে
কোথাও রবে না দ্বন্দ্ব।
মরমে মরমে সরমপরশে
বাতাস লাগিল হাড়ে,
ভাষার প্রবাহে পুলক কম্পে
জড়ের জড়তা ছাড়ে।
(তবে) আয় নেমে আয়, জড়ের সভায়
জীবনমরণ দোলে
আর নেমে আয় ধরণী ধুলায়
কীর্তন কলরোলে।'

ইহার পর কণ্ঠ্য বর্ণের আরম্ভ।... কঠিন এই কাজ, ধীরে ধীরে রচনা অগ্রসর হইতেছিল। যতটুকু রচিত হইত তাহা আমাদের আসরে শুনাইতেন। আমরা নির্বাক বিস্ময়ে সুকুমারের ভাষা ও ছন্দের উপর দখল উপভোগ করিতাম। রচনা 'চ' অবধি অগ্রসর হওয়ার পর নানা কাজের চাপে ইহা বন্ধ থাকে, সম্পূর্ণ হয় নাই।

বিলাতী 'ননসেন্স রাইম'-এর অনুসরণে কবিতা রচনার আরম্ভও এই 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'য়। সেগুলি আরও কতকগুলি সন্দেশের জন্য লিখিত কবিতা সংযোজিত করিয়া ও তাহা চিত্রিত করিয়া সুকুমারের অনবদ্য রচনা 'আবোল তাবোল' পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

পোর্ট আর্থার ডিনার

এই ক্লাবের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা হইল জাপান কর্তৃক পোর্ট আর্থার জয়ের পর শক্তিধর পাশ্চাত্য রাষ্ট্র রাশিয়ার প্রাচ্যের এক ক্ষুদ্র জাতি জাপানের নিকট এরূপ পরাজয়ে এশিয়ার নবজাগরণে ক্লাবের সদস্য বর্গ উৎসাহের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী স্ট্রীটের ইম্পিরিয়াল হোটেলে পোর্ট আর্থার ডিনার উৎসব।

ক্লাবের সদস্যগণ অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বে সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল, ভবে পদ্মপত্রের জল, সদা কর্চ্ছি টলমল', গানটি গাহিতেন। এইটিকে তাঁহার ক্লাবের প্রতীকী সংগীত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সদস্যগণ পরম উৎসাহে ক্লাবে যোগ দিতেন এবং উহার মাধ্যমেই তাঁহাদের মনে সাহিত্য রসের স্ফুরণ ঘটে।

কয়েক বৎসর চলার পর কয়েকজন সদস্য কলিকাতা ত্যাগ করিলেন, এবং কতিপয় সদস্যের অকাল মৃত্যু ঘটিলে বাহিরে বন্ধুমহল হইতে সদস্য সংগ্রহের তাগিদ অনুভূত হয় এবং সেজন্য ক্লাবের কাঠামোও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া তাহা 'মন্‌ডে ক্লাব'-এ রূপান্তরিত হয়। সদস্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন সদস্যগণ অনুভব করিলেন যে ক্লাবের অধিবেশন কেবলমাত্র সুকুমার রায়ের গৃহে হইলে তাঁহার উপর অত্যাচার করা হয়। কেন না ক্লাবের একটি চলতি আচার প্রায় নিয়মে পর্যবসিত হইয়াছিল যে অধিবেশনের হয় পূর্বে না হয় পরে সদস্যগণকে ভুরিভোজনে আপ্যায়িত করা। সেজন্য স্থির হয় পর্যায়ক্রমে সদস্যদের বাড়িতে অধিবেশন বসিবে, কবে কাহার বাড়িতে অধিবেশন বসিবে তাহা সুকুমার ঠিক করিয়া পত্র মারফৎ সদস্যগণকে জানাইবেন। যাঁহার গৃহে অধিবেশন হইবে তিনি সদস্যগণ ব্যতীত নিজেদের ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুসারে বাহির হইতে সুধীজনকে আমন্ত্রিত করিতে পারিবেন।

পরিবর্ধিত এই ক্লাবের প্রাথমিক সদস্য ছিলেন সুকুমার রায়, তাঁহার দুই ভ্রাতা সুবিনয় ও সুবিমল, আমি, অমলচন্দ্র হোম, হিতেন্দ্রনাথ বসু, ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, শিশিরকুমার দত্ত, কালিদাস নাগ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, হিরণকুমার সান্যাল, শ্রীশচন্দ্র সেন, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, অতুলপ্রসাদ সেন, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, ধীরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত ও জীবনময় রায়। কালিদাস নাগের আহ্বানে তাঁহার মাতুলের আলিপুর জুলজিক্যাল সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত গৃহের প্রাঙ্গনে ওই গৃহে অধিবেশনের পূর্বে একটি আলোকচিত্র গৃহীত হয়।

ক্লাবের সদস্যগণের একত্রে গৃহীত সেইটি একমাত্র আলোক-চিত্র।

অতুলপ্রসাদ সেন লক্ষ্ণৌতে প্রত্যাবর্তন করিলে ও গিরজাশঙ্কর আসা বন্ধ করিলে কিরণশঙ্কর রায়, কুমুদশঙ্কর রায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সদস্যরূপে ক্লাবে মনোনীত হইয়া যোগদান করেন। তখন কিরণশঙ্কর ... প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। এরূপ গুণীজন সমাবেশে আলোচনা সে অত্যন্ত উচ্চদরের ও খুব হৃদয়গ্রাহী হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে মধ্যে মধ্যে এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাও হইত যাহার মর্ম সকলের বোধগম্য হইত না। ... প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ সবেমাত্র সংখ্যাতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। উহার রস আমাদের ন্যায় অভাজনের কাছে পরিবেশনের মহৎ উদ্দেশ্যে প্রশান্তচন্দ্র আমার গৃহেরই এক অধিবেশনে ... একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধে নাকি সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তি লইয়া আলোচনা ছিল। সম্ভবত তাহা গভীর অনুশীলনের ফল কিন্তু আমরা অনেকেই তাহার বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারি নাই। অতুলবাবুর গৃহের অধিবেশনে অতুলবাবুর রচিত গান সুকণ্ঠে এবং তাঁহার অতিথি সুবিখ্যাত কবি হরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গীত হইয়া আমাদের মুগ্ধ করিত। ... আমার গৃহে অতিথিরূপে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম ও অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া সদস্যদের আনন্দবর্ধন করিয়াছিলেন।

বৈঠকের সম্পাদকরূপে শিশিরকুমার দত্ত নির্বাচিত হইয়া অধিকারী নাম গ্রহণ করিলেও সুকুমার কবে কাহার গৃহে অধিবেশন হইবে স্থির করিয়া সদস্যগণকে আমন্ত্রণলিপি প্রেরণ করিতেন। তাঁহার প্রতিটি আমন্ত্রণলিপি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর ছিল।

বিচিত্র আমন্ত্রণলিপি

এই বিচিত্র আমন্ত্রণলিপিগুলি যেমন রসপূর্ণ তেমনই অভিনব। ... যেমন সাহিত্যালোচনায় তেমনই ভোজনে সদস্যগণের সমান উৎসাহ ছিল। সুকুমার তাঁহার এক আমন্ত্রণলিপিতে তাই রহস্য করিয়া লিখিয়াছিলেন—

'কেউ বলেছে খাবো খাবো
কেউ বলেছে খাই,
সবাই মিলে গোল তুলেছে
আমি তো আর নাই।
চুটকু বলে রইনু চুপে
কমাস ধরে কাহিল রূপে
জংলি বলে রামছাগলের
মাংস খেতে চাই।
যত বলি সবুর কর,
কেউ শোনে না কালা।
জীবন বলে কোমর বেঁধে
কোথায় লুচির থালা?
খোদন বলে রেগে মেগে
ভীষণ রোষে বিষম রেগে
বিষ্যুৎবারে গড়পারেতে
হাজির যেন পাই।'

একবার সম্পাদক শিশিরকুমার কার্যোপলক্ষে পাটনা গিয়াছিলেন, আমনি নিমন্ত্রণপত্রে বাহির হইল—

'হায়! হায়, সম্পাদক হারাইয়া গিয়াছেন, নতুবা তহবিল তছরুপ করিয়া পলাতক হইয়াছেন। সদস্যগণ গড়পারে হাজির হইয়া কিংকর্তব্য যেন নির্ধারণ করেন।'

সেই সময়ে শিশিরবাবু গ্রেশাম ইন্সুরেন্স কোম্পানীর বাঙলা বিহারের সংগঠক ছিলেন। তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া পত্রটির এক কোণে লেখা হইল, 'Insure with Gresham at once.'

আর একটি পত্র ছিল—

'একদা নিশীথে সম্পাদক গোবেচারা
পোঁটলাপুঁটলী বাঁধি হইলেন দেশছাড়া।
অনাহারী সম্পাদকী হাড়ভাঙা খাটুনী সে
জানে তাহা ভুক্তভোগী
অপর বুঝবে কি সে?
ক্লাবের সকল সভ্যে বেশ দিয়া ফাঁকি
বেচারা ভাবিল মনে—
বিদেশে লুকাইয়া থাকি।
এদিকেতে ক্রমে ক্রমে মাস সব হয় শেষ
নোটিশ দিলাম কত সম্পাদক নিরুদ্দেশ।
সভ্যগণ দলে দলে রুষিয়া কহিল তবে
জ্যান্ত হোক, মৃত হোক ব্যাটারে ধরিতে হবে।
একদা কেমনে জানি সম্পাদক মহাশয়
পড়িলেন ধরা—আহা দুরদৃষ্ট অতিশয়।
তারপরে কি ঘটিল, কি করিল সম্পাদক
সে সকলের বিকিরণে নাহি কোনো আবশ্যক।
মোট কথা হতভাগ্য সম্পাদক অবশেষে।
বসিলেন আপনার প্রাচীন গদিতে এসে।'

রবিবার ১০ই চৈত্র
প্রফেসার সুরেন মৈত্র
আবাহন করেন সবে
শিবপুরে আপন ভবে।

মহাশয় সর্ব্ব বুঝে
চাঁদপালে জাহাজ খুঁজে,
চড়িবেন যেমন রীতি
নিবেদন সাদর ইতি—

মণ্ডা-সম্মিলন

(সুর—"আমাদের শান্তিনিকেতন")

আমাদের মণ্ডা-সম্মিলন!
—আরে না—তা' না, না—.
আমাদের Monday-সম্মিলন!
আমাদের হল্লারই কুপন!
তার উড়ো চিঠির তাড়া
মোদের ঘোরায় পাড়া পাড়া,
কভু পশুশালে হাঁসপাতালে আজব আমন্ত্রণ!
(কভু কলেজ-ঘাটেধাপার মাঠে ভোজের আকর্ষণ!)
মোদের চারু-বাবুর দধি,
মোদের কারু ঘোলের নদী,
মোদের জংলী-ভায়ার সরবতে মন মাতাল অদ্যাবধি!
মোদের আলোচনার রীতি
দেশে জাগায় বিষম ভীতি,
কভু ভেয়ারহারেন উঁকি মারেন, ভাম্বেরী, ভিলন!
মোদের গানের বিপুল বেগে
পাড়া আঁৎকে ওঠে জেগে,
ঢিল ছুড়িতে সুরু করে বেজায় রেগেমেগে।
মোদের নাচ যদি পায়, তবে
কি যে হয় শোনো তা সবে,—
নাগ বাসুকীর ঘাড় খচে যায়, হয় ভূমিকম্পন!
(নাগ কালিদাস হয় কাবু হায়, পায় দশা খোদন!)
মোরা হপ্তা বাদে জুটি
সবাই হাঁপিয়ে ছুটোছুটি,
রাধাবল্লভে মন নেইকো, রাধাবল্লভী বেশ লুটি!
মোদের কালোর সঙ্গে শাদায়
এ যে মিলিয়েছে দই-কাদায়,
মোটার সঙ্গে কাহিলকে ভাই করেছে বন্ধন!
আমাদের মণ্ডা-সম্মিলন!

২১ আগষ্ট ১৯১৮
মণ্ডা-সম্মিলনের তৃতীয় জন্মদিন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

B. M. Press.

শুভ সংবাদ

সম্পাদক জীবিত আছেন

আগামী সোমবার
২৫নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে
৬॥ ঘটিকার সময়
তাঁহার শ্রীমুখচন্দ্র দর্শ...
ভক্তসমাগম হইবে...

তাকবিভাগ
শ্রী সম্পাদক

...ন আমার
...অগত্যা সুকুমার
...ব্যবস্থা করে এসেছি যে
আগামী মঙ্গলবার (৩০শে জুলাই)
...সময় আপনি সশরীরে হাজির হবেন।
...নীতি বাবুর ভোজের পাত সেইখানেই পড়বে।
এখন খুসী হলেন ত?

মোচ্ছব

আগামী রবিবার ২৬শে মে
পূর্ব্বাহ্ন ৯-১৫ ঘটিকায়
শিয়ালদহ ২নং রোয়াকমঞ্চ হইতে
বাষ্পীয় শকট আরোহণপূর্ব্বক
গোবরডাঙ্গা প্রয়াণ।
আপনি না আসিলে জমিবে না

আঃ! আবার খাওয়া!!

এইত সেদিন সবাইকে বুঝিয়ে বল্লুম যে আ...
"খাই খাই" ক'রো না—এর মধ্যে আবার সুনীতি
বাবু খাওয়াতে চাচ্ছেন! আমার হাতে কতগুলো
টাকা গছিয়ে দিয়ে, এখন বলছেন, না খাওয়ালে
জংলি বাবুকে দিয়ে মোকদ্দমা করাবেন।
হাতে পায়ে ধ'রে নিষেধ করলুম, তা কি...
শুনলেন না, উল্টে আমায় ...
দেখুন দেখি কি অন্যায় ...
উপদেশমত ...

এই কবিতাটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে সিগনেট প্রেস হইতে প্রকাশিত বর্ণমালাতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথও ক্লাবের ভোজনবিলাসের কথা স্মরণ করিয়া একিটি অনবদ্য কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।...কবিতাটি সবটা আমার স্মরণে নাই, তবে এই লাইন কটি মনে আছে—

'আমাদের মণ্ডা সম্মেলন,
হায়রে আমাদের মণ্ডা সম্মেলন।
চারুবাবুর দধি,—কারু ঘোলের নদী
জংলি ভায়ার সরবতে মন মাতাল
অদ্যাবধি ইত্যাদি।'

চারুবাবু জাফরান অন্যান্য কতিপয় মসলা সহযোগে হরিদ্রাবর্ণের এক প্রকার দধি করিতেন, এইটি তাঁহার খাদ্য-তালিকায় বৈশিষ্ট্য ছিল। সুনীতিবাবুর নানা প্রকার ঘোলের সরবতে সকলের মন পরিতৃপ্ত হইত। আমার বাড়ির বিশেষত্ব ছিল নানা প্রকার সরবৎ ও পেস্তা বাদাম প্রভৃতির সহযোগে চিড়া ভাজা ও নানা প্রকারের পিঠাপুলি। অধিবেশনের জন্য বাড়ির মেয়েরা অতি পরিশ্রমের সহিত এসব খাদ্য প্রস্তুত করিতেন। সুকুমারগৃহিনী নানাপ্রকার রন্ধনে অতিশয় নিপুণা ছিলেন এবং নানাপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিয়া সম্মানিত অথিতিদের অপ্যায়ন করিতেন। প্রত্যেকেই বাড়িতে কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ খাদ্যতালিকা সভ্যবর্গের রসনা তৃপ্ত করিত। ভোজনবিলাস এত বাড়িয়া যায় যে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রস্তাব করেন যে অধিবেশনের ভোজন বিস্তার রহিত করা হউক। কিন্তু সদস্যগণ তাহা সমর্থন করেন না, কেন না তাঁহাদের প্রতি এই সম্মেলন যেমন সাহিত্য, সংগীত অনুশীলনের জন্য, তেমনই রসনা দপ্তর ইহার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইহা একাধারে 'Literary and Gastronomical Club.' ছিল। কোনও কোনও সদস্য বাহির হইতেও নানা সুখাদ্য, বিশেষত মিষ্টান্ন আনিয়া পরিবেশন করিতেন। সুকুমারের আমন্ত্রণলিপি যে কেবল কবিতাতেই রচিত হইত তাহা নহে, কবিতাহীন ব্যঙ্গচিত্রেও এরূপ লিপি প্রেরিত হইত। আমার বাড়ির অধিবেশনের একটি ব্যঙ্গচিত্রে খাবার প্লেট হস্তে ও পাশে বাঁয়া তবলা যে লোকটির ছবি তাহার সহিত ক্লাবের অধিকারী শিশিরকুমার দত্তের আকৃতিগত মিল খুব বেশি।

যে ক্লাবে বিদগ্ধজন সদস্য ছিলেন, সেই সভা কেবলমাত্র লঘু আনন্দ পরিবেশ করিয়া ক্ষান্ত থাকিবেন, চিন্তার খোরাক ও রসবোধ বৃদ্ধির আয়োজন করিবেন না ইহা সম্ভবপর নয়।

আমাদের ক্লাবের প্রথম বার্ষিকী বিবরণী (আগস্ট, ১৯১৫ —জুলাই ১৯১৬)তে আলোচিত বিষয়াদি ...হইতে বাছিয়া কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করিলে উহার বৈচিত্র্য ও গুরুত্ব উপলব্ধির সহায়ক হইবে। প্রথমেই অজিতকুমার চক্রবর্তী, হুইটম্যান ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তুলনামূলক এক মনোজ্ঞ আলোচনা...অজিতবাবু শেলী সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ ও রবীন্দ্র-নাথের 'রাজা' নাটকের উপরে একটা আলোচনা ...অতুল-প্রসাদ সেন নির্বাচিত কয়েকটি কবিতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অমলচন্দ্র হোম অস্কার ওয়াইল্ড সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। কালিদাস নাগ বিজ্ঞানের ও সাহিত্যের ইতিহাস, কালিদাসের রঘুর দিগ্বিজয়ের ভূগোল ও মেঘদূতে ভূগোল সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, রামমোহন রায় অ্যাস্ এ জুরিষ্ট, রামমোহন রায় অন রেভিনিউ অ্যান্ড জুডিসিয়্যাল সিস্টেম, রামমোহনের সময়কার বাংলাদেশ, রামমোহন তান্ত্রিক ছিলেন কিনা, ক্রিমিন্যাল লয়স্ অফ মনু, নীৎসে ও রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করেন। সুকুমার রায় কেবল দু'টি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন—'এস্থেটিক সুপারস্টিশন' ও 'ফাংশন অফ আর্ট'। সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় 'ফাইলোলজি অ্যাস্ এ সায়েন্স'এ বর্ণমালা সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য পেশ করেন ও জার্মানী প্রত্যাগত ডক্টর শ্রীশচন্দ্র সেন একদিন নীৎসের দর্শন ও অপর দু'দিন আয়কেনের দর্শন সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী সরল আলোচনা করিয়া সকলকে তৃপ্ত করেন।...ইহা ব্যতীত ওই বৎসর পনেরোবার সাধারণ জল্পনা ...পাঁচবার সংগীতের আসর ও একবার উদ্যানযাত্রা (আলিপুর চিড়িয়াখানায়) হয়।

দ্বিতীয় বর্ষে আলোচিত বিষয়াদি ...অজিতকুমার চক্রবর্তী শিল্প ও সাহিত্য, ভাবী সাহিত্য সম্পর্কে জল্পনাকল্পনা, অতুলপ্রসাদ সেন চেষ্টারটনের 'ওয়ারশিপ অফ দি ওয়েলদি', অমলচন্দ্র হোম কিপ্লিং-এর 'ব্যারাক রুম ব্যালাড', ...কালিদাস নাগ উড়িষ্যার প্রাচীন শিল্প, গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী বিবেকানন্দ ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ... দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মোপাঁসার 'এ নাইট ইন স্প্রিং', নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত

তুর্গেনেভের নভেল, শ্রীশচন্দ্র সেন 'নিওন্যাচারালিজম' এবং 'থটস্ অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স', সুকুমার রায় স্বরচিত টাটকা নতুন 'সন্দেশ' ও 'চলচিত্তচঞ্চরী' পাঠ, 'ক্রিটিসিজম—ট্রু অ্যান্ড ফলস' ও রাস্কিনের 'মডার্ন পেন্টার্স' ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'ইতিহাসের ধারা' সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ ...

ইহা ব্যতীত জল্পনাকল্পনা, সংগীতাদি, রবীন্দ্র সংবর্ধনা, বিদায় সংবর্ধনা, একবার বরাহনগর ও একবার কোলাঘাট উদ্যানযাত্রা হয়। কোলাঘাট যাত্রায় সারাদিন স্টীমারে আনন্দ-উৎসব, আলোচনা, সংগীত ও ভূরিভোজনের পর অপরাহ্নে কোলাঘাটে অবতারণান্তে ডাকবাংলোতে পূর্ণিমা নিশি-যাপনের এক সুন্দর অভিজ্ঞতা... এক অবিস্মরণীয় উপলব্ধি যাহা বর্ণনা করার সাধ্য আমার নাই।

জীবনে আমি বহু ক্লাবের সংস্পর্শে আসিয়াছি, এমন কি রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 'বিচিত্রা'র সদস্য হইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল কিন্তু বলিতে দ্বিধা নাই যে মন্‌ডে ক্লাবের ন্যায় এত বিচিত্র এবং এত রসে ভরপুর কোনও ক্লাব আমি আর দ্বিতীয় দেখি নাই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যে সভার প্রাণ সেই বিচিত্রায় পরিবেশিত রবীন্দ্রসৃষ্ট সাহিত্যের পরিবেশন ও রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য অভিনয় যে অতুলনীয় তাহা বলাই বাহুল্য; উহা তুলনাতীত কিন্তু উহার রস পরিবেশন সীমিত, মন্‌ডে ক্লাবের ন্যায় বহুধা প্রসারিত নহে। সুকুমার রায়ের ন্যায় বিচিত্র প্রতিভার অধিকারীর পরিকল্পনায় যাহা সম্ভব হইয়াছিল সেরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন যে খুবই কঠিন সন্দেহ নাই, তাই সুকুমারের অকাল বিয়োগে ইহার অবলুপ্তি অনিবার্য হইলেও বেদনা-দায়ক সন্দেহ নাই। আজ ক্লাবের চবিবশজন সদস্যের মধ্যে আমরা মাত্র সাতজন জীবিত আছি। ...

কয়েকখানি বিচিত্র আমন্ত্রণলিপি

...আর কয়েকটি কৌতুককর বিষয় নিবেদন করিব। ক্লাবের তৃতীয় বার্ষিক জন্মোৎসবের আমন্ত্রণলিপি এইরূপ ছিল—

'জন্মোৎসব ভক্তিবিনয়ভাবগদগদধূলিলুণ্ঠিতপ্রণতি-পুরঃসর নিবেদনমেতৎ—

আগামী ২১শে আগস্টবুধবার আসন্ন গোধূলিলগ্নে শ্রীশ্রীক্লাবের তৃতীয় জন্মোৎসব উপলক্ষে মেয়ো হাসপাতালে ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের ইষ্টককুঞ্জে ভক্ত সমাগম ও প্রসাদ বিতরণ হইবে। মহাশয় উক্ত উৎসবক্ষেত্রে পদারবিন্দরজ অর্পণ করতঃ কীর্তন কোলাহলে যোগদান-পূর্বক প্রসাদ গ্রহণ—

ইতি

কৃতাঞ্জলি সেবকাধম

শ্রীশিশিরকুমাক দত্তদাসস্য'

দ্বিতীয় বার্ষীক জন্মোৎসবের আমন্ত্রণ লিপি আরও বিচিত্র।... সম্পাদক শ্রীশিশিরকুমার দত্তের বকলমে সুকুমার এই লিপিটি সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করেন। পত্রের বয়ানটি এইরূপ—

'সম্প্রতি ক্লাবের সর্বজনস্বীকৃত সম্পাদকরূপে আমি অধিকারী উপাধি গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে কোন কোন ঈর্শ্বাপরায়ণ সভ্য অসঙ্গতভাবে আপত্তি করিয়াছেন। কালিদাসবাবু আপত্তি করিতে চাহেন করুন, কিন্তু আমি স্বোপার্জিত উপাধি ছাড়িব না। এই প্রকার অন্যায় আপত্তির বিশেষ প্রতিবাদ বাঞ্ছনীয়। অনেক হিসাব করিয়া দেখিলাম আগামী মঙ্গলবার ২১আগস্ট, বাংলা তারিখ জানি না, আমাদের ক্লাবের জন্মদিন অর্থাৎ প্রায় জন্মদিন। ওই দিন সন্ধ্যার সময় ১০০ নম্বর গড়পার রোড, অর্থাৎ কালাবোবা ইস্কুলের পশ্চাতে সুকুমারবাবু নামক ক্লাবের একজন আদিম ও প্রাচীন সভ্যের বাড়িতে সভার আয়োজন হইয়াছে। বক্তা প্রায় সকলেই, সভাপতি আপনি, বিষয় গম্ভীর সুতরাং খুব জমিবার সম্ভাবনা। আসিবার সময় একখানা সেকেন্ড ক্লাস গাড়ি সঙ্গে আনিবেন—আমায় ফিরিবার পথে নামাইয়া দিতে হইবে। খাওয়া গুরুতর হইবার আশঙ্কা আছে।

ইতি

শ্রীশিশিরকুমার দত্তাধিকারী

সুযোগ্য সম্পাদক'

দ্বিজেন্দ্রবাবুর বাড়িতে এক বৈঠকের আমন্ত্রণলিপি ঃ

'সোমবার, ২২এপ্রিল, ১৯১৮, সন্ধ্যা ৬।। টা

তবে 'রইল কথা', —

এবার

চাঁদিনী রাতে
মেয়োর ছাতে
গাঙের হাওয়া
সঙ্গে গাওয়া;
সেথা
নাইকো বাধা
নাইকো আধা

ভরা প্রাণের ভরা পালে
সোমবার তরণীখানি
উজান স্রোতে
নেশায় মেতে
চলবে ছুটে দিক না মানি।'

সম্পাদক মহাশয় নিরুদ্দেশের পর কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলে সুকুমার যে আমন্ত্রণলিপি প্রেরণ করেন ... তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—

'ভেবেছিনু গেছে গেছে
ভেবেছিনু নাই সে।
দাড়ি নেড়ে চাঁদা চায়
আষাঢ়ের তেইশে।'

কৌতুক সৃষ্টি করিতে সুকুমার রায়ের অসামান্য দক্ষতার সামান্য কিছু পরিচয় দিলেও... তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত অসামান্য কীর্তি গৌরবের অনেক কথাই অনালোচিত রহিয়া গেল। বিশেষত সৌন্দর্য্যতত্ত্বে তাঁহার গভীর অনুপ্রবেশ, সুকুমার কলা ও চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা এবং দর্শন ও ভগবততত্ত্বে গভীর অনুপ্রবেশের পরিচয় ব্যতীত মানুষটিকে ঠিক বুঝা যায় না। এই সব সদ্‌গুণরাশির জন্য তিনি ব্রাহ্মযুবকগণের অবিসংবাদিত নেতা হইয়াছিলেন এবং নিজের চারিপাশে নানা সম্প্রদায়ের নানা গুণের আধার বিবিধ ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহারই সামান্য একটু পরিচয় হইল আমাদের এই মন্‌ডে ক্লাব।

শিশু ও কিশোরদের তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল বলিয়া তাহাদের মনে অনাবিল আনন্দরস পরিবেশনে.... বাংলার শিশুসাহিত্য 'আবোল তাবোল', 'ঝালাপালা', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', প্রভৃতিদ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে....।

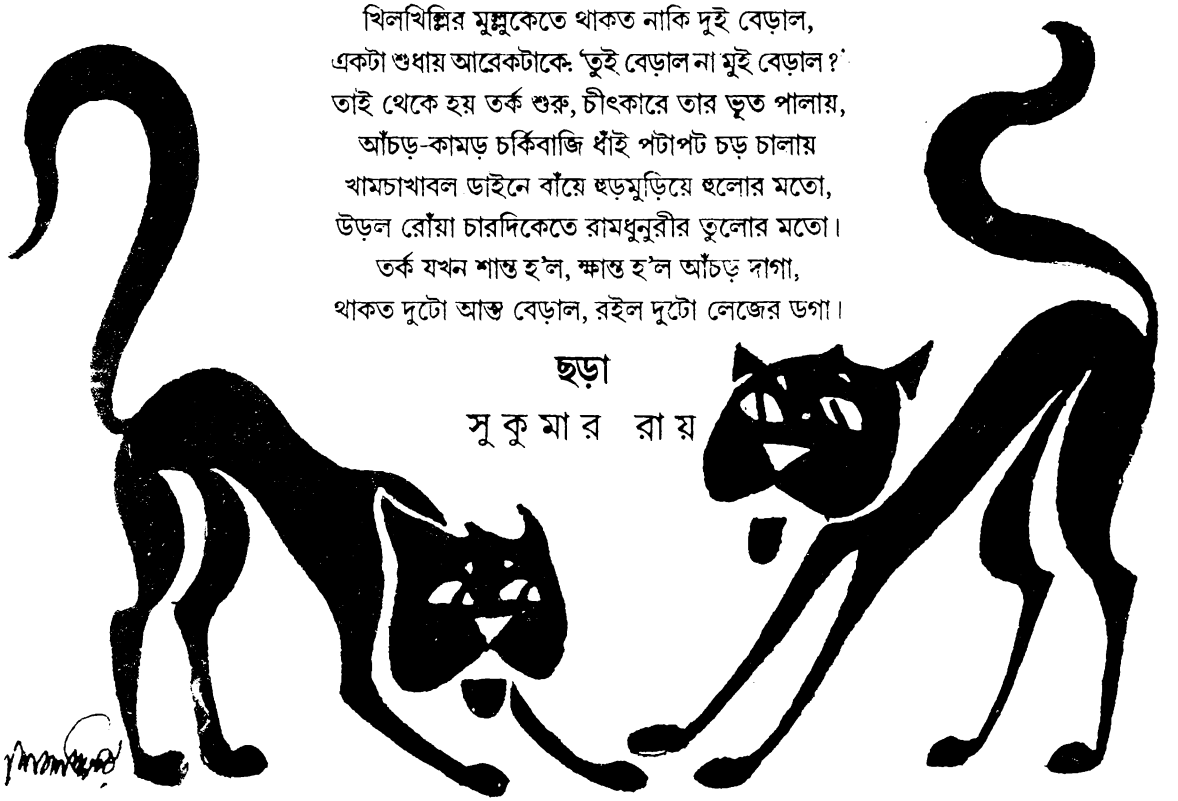

খিলখিল্লির মুল্লুকেতে থাকত নাকি দুই বেড়াল,
একটা শুধায় আরেকটাকে: 'তুই বেড়াল না মুই বেড়াল?'
তাই থেকে হয় তর্ক শুরু, চীৎকারে তার ভূত পালায়,
আঁচড়-কামড় চর্কিবাজি ধাঁই পটাপট চড় চালায়
খামচাখাবল ডাইনে বাঁয়ে গড়মুড়িয়ে গুলোর মতো,
উড়ল রোঁয়া চারদিকেতে রামধনুরীর তুলোর মতো।
তর্ক যখন শান্ত হ'ল, ক্ষান্ত হ'ল আঁচড় দাগা,
থাকত দুটো আস্ত বেড়াল, রইল দুটো লেজের ডগা।

ছড়া
সুকুমার রায়

সত্যজিৎ রায়

সত্যজিৎ রায়ের করা তথ্যচিত্রের পরিচয়-লিপি

ধারা-ভাষ্যর খসড়া। সত্যজিৎ রায়ের লাল খেরোর খাতা থেকে

চিত্রনাট্য, সংগীত ও পরিচালনা

সত্যজিৎ রায়

প্রযোজনা **তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার**

ভাষ্যপাঠ **সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়**

ক্যামেরা **বরুণ রাহা**
শিল্প নির্দেশক **অশোক বোস**
সম্পাদক **দুলাল দত্ত**
শব্দগ্রহণ **সুজিত সরকার**
মেক-আপ **অনন্ত দাশ**
গান **অনুপ ঘোষাল**

অভিনয়ে

'ঝালাপালা'
উৎপল দত্ত (পণ্ডিত মশাই)

'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (রাম), তপেন চট্টোপাধ্যায় (দূত), চিরঞ্জিত (লক্ষ্মণ), বিমল দেব (বিভীষণ), নির্মল ঘোষ (সুগ্রীব), রমেশ মুখোপাধ্যায় (জাম্বুবান)

'হ য ব র ল'
সন্তোষ দত্ত (বুড়ো), সম্বর্ত সরকার (আমি)

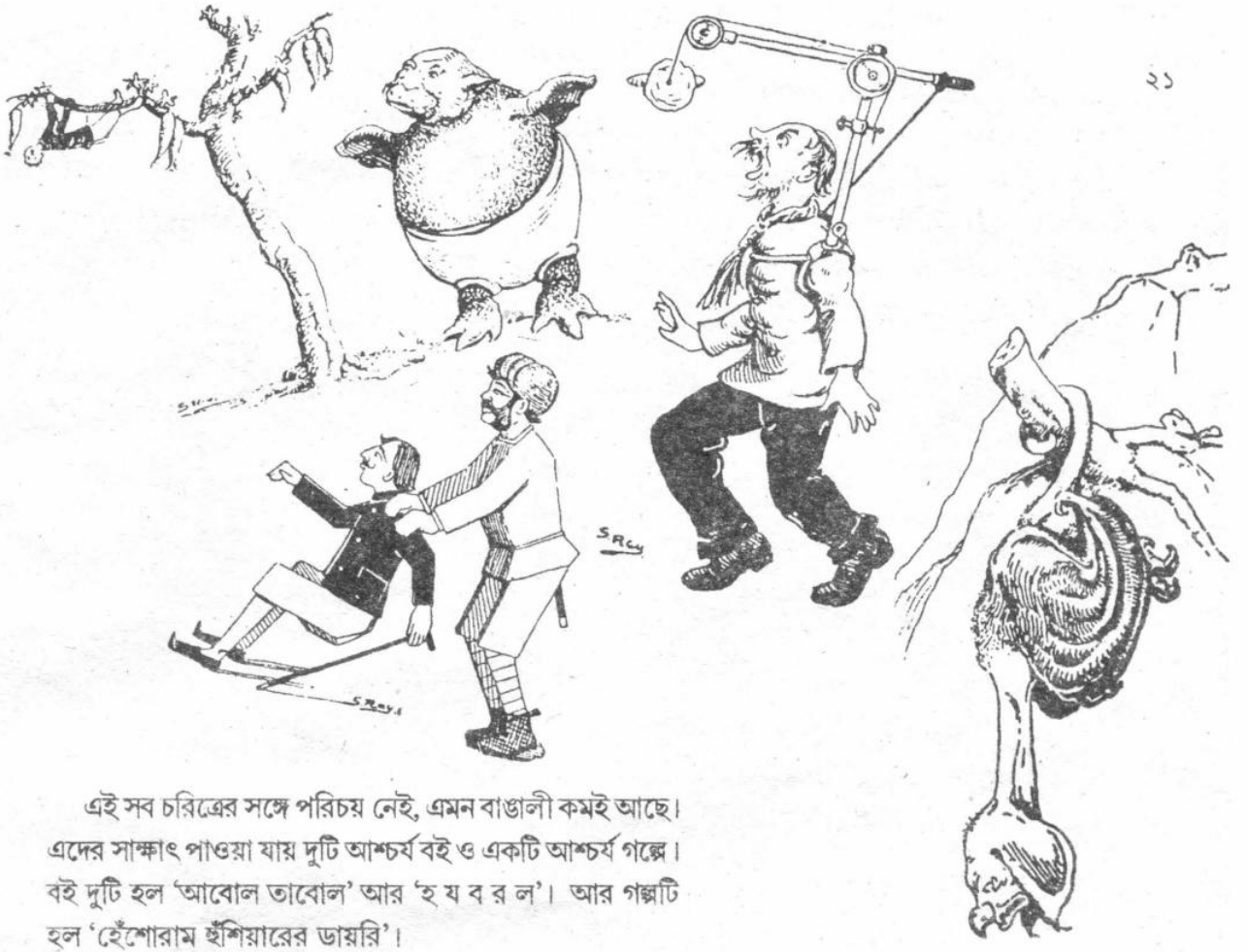

এই সব চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় নেই, এমন বাঙালী কমই আছে। এদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় দুটি আশ্চর্য বই ও একটি আশ্চর্য গল্পে। বই দুটি হল 'আবোল তাবোল' আর 'হ য ব র ল'। আর গল্পটি হল 'হেঁশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়রি'।

এদের স্রষ্টা হলেন সুকুমার রায়—যাঁর জন্ম হয়েছিল আজ থেকে একশো বছর আগে।

সুকুমারের পিতা ছিলেন ময়মনসিংহের মসুয়া গ্রামের জমিদার হরিকিশোর রায়চৌধুরীর দত্তক পুত্র, কামদারঞ্জন। দত্তক নেবার পর কামদারঞ্জনের নাম হয় উপেন্দ্রকিশোর। উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন পাঁচ ভাইয়ের এক ভাই।

বড় ছিলেন সারদারঞ্জন। তারপর উপেন্দ্রকিশোর। তারপর মুক্তিদারঞ্জন। চতুর্থ কুলদারঞ্জন ও পঞ্চম প্রমদারঞ্জন।

সারদারঞ্জন

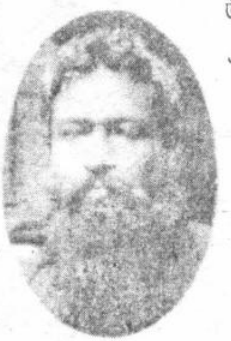

মুক্তিদারঞ্জন

উপেন্দ্রকিশোর

বড় ভাই সারদারঞ্জন ছিলেন সংস্কৃত ও গণিতে পণ্ডিত। তাঁর লেখা বই পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহার হত। সারদারঞ্জন মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এ ছাড়া তাঁর আরেকটি পরিচয় ছিল। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড়।

উপেন্দ্রকিশোর খেলোয়াড় ছিলেন না, কিন্তু তাঁর মধ্যে নানান গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি ছিলেন চিত্রকর, বৈজ্ঞানিক, অনন্য শিশুসাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ ও মুদ্রণশিল্পে অগ্রণী গবেষক। উপেন্দ্রকিশোরই ছিলেন একমাত্র ভারতীয়, যাঁর লেখা প্রবন্ধ বিলাতের বিখ্যাত মুদ্রণশিল্পের বার্ষিকী 'পেনরোজ অ্যানুয়েল'এ প্রকাশিত হত। তার সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের তোলা ছবিও থাকত।

তৃতীয় ভাই মুক্তিদারঞ্জন গণিতজ্ঞ ও দুর্দ্ধর্ষ খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি মেট্রোপলিটন কলেজে অধ্যাপনা করতেন।

কুলদারঞ্জনও ক্রিকেট খেলতেন। তাছাড়া তিনি দেশবিদেশের পৌরাণিক কাহিনী ও বিখ্যাত ইংরাজি গল্পের কিশোরপাঠ্য অনুবাদ করে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

প্রমদারঞ্জন সরকারী জরীপ বিভাগে কাজ করতেন। তিনি তাঁর কর্মজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা 'বনের খবর'এ লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

কুলদারঞ্জন

প্রমদারঞ্জন

ছয় সন্তান ও পত্নীসহ উপেন্দ্রকিশোর। বাঁ দিক থেকে : শান্তিলতা, বিধুমুখী, পুণ্যলতা, সুকুমার, উপেন্দ্রকিশোর, সুবিনয় , সুবিমল ও সুখলতা। নিচে: সুকুমার

এই পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তিন ভাই—উপেন্দ্রকিশোর, কুলদারঞ্জন ও প্রমদারঞ্জন—ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তা সত্ত্বেও, পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য চিরকাল অটুট ছিল।

ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় স্বাধীনচেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা বিধুমুখীকে উপেন্দ্রকিশোর বিবাহ করেন। ততদিনে উপেন্দ্রকিশোর মসুয়া থেকে কলকাতায় চলে এসে রয়েছেন তেরো নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে।

উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন ছয়টি সন্তানের জনক। এঁদের মধ্যে বড় ছিলেন কন্যা সুখলতা। তারপর সুকুমার। তারপর বোন পূণ্যলতা, চতুর্থ সুবিনয়, পঞ্চম শান্তিলতা ও সর্বকনিষ্ঠ সুবিমল।

সিটি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে, সুকুমার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে ডবল অনার্স নিয়ে বি.এস.সি. পাশ করেন। তাঁর অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন রাসায়নিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সেই সময় রায় পরিবার থাকতেন সুকিয়া স্ট্রীটে।

'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'র প্রচ্ছদ

কলেজে থাকতেই সুকুমার একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন, যার নাম দেওয়া হয় 'নন্‌সেন্স ক্লাব'। এই নন্‌সেন্স ক্লাবের একটি হাতে লেখা পত্রিকা ছিল, যার নাম 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'।

যে বিশেষ হাস্যরসের সঙ্গে সুকুমারের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে যায়, সেই খেয়াল রসের প্রথম প্রকাশ সাড়ে বত্রিশ ভাজার পাতাতেই।

এই নন্‌সেন্স ক্লাবের সভ্যদের দিয়ে অভিনয় করানোর জন্য সুকুমার দুটি নাটক রচনা করেছিলেন। একটি হল 'ঝালাপালা'।

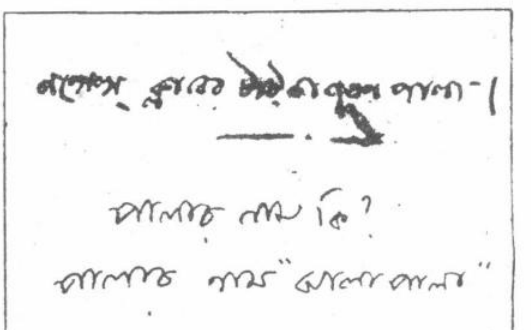

'ঝালাপালা' পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতা

এই 'ঝালাপালা'র একটি দৃশ্যে পাঠশালার ছাত্র পণ্ডিতমশাইকে জিজ্ঞেস করছে—'আই গো আপ— উই গো ডাউন'—মানে কি।

উৎপল দত্ত (পণ্ডিতমশাই)

পণ্ডিত। 'আই' —'আই' কিনা চক্ষুঃ, 'গো'—গয়ে ওকারে গো—'গৌ গাবৌ গাবঃ', ইত্যমরঃ, 'আপ্' কিনা আপঃ, সলিলং বারি, আর্থাৎ জল —গরুর চক্ষে জল — অর্থাৎ কিনা গরু কান্দিতেছে—কেন কান্দিতেছে — না 'উই গো ডাউন,' কিনা 'উই' অর্থাৎ যাকে বলে উই পোকা— 'গো ডাউন,' অর্থাৎ গুদোমখানা — গুদোমঘরে উই ধরে আর কিছু রাখলে না— তাই না দেখে, 'আই গো আপ'—গরু কেবলি কান্দিতেছে—

অন্য নাটকটি হল 'লক্ষ্মনের শক্তিশেল'।

প্রথম দৃশ্যের ঘটনাস্থল হল লঙ্কায় রামের শিবির। পাত্রেরা হলেন রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, বিভীষণ, জাম্বুবান ও পারিষদবর্গ। প্রথম বক্তা স্বয়ং রামচন্দ্র—

তথ্যচিত্রে 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'। নির্মল ঘোষ (সুগ্রীব), বিমল দেব (বিভীষণ), চিরঞ্জিত (লক্ষ্মণ), রমেশ মুখোপাধ্যায় (জাম্বুবান), সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (রাম) ও অন্যান্য

ত্তিরে আমি একটা চমৎকার স্বপ্ন
। দেখলুম কি, রাবণ ব্যাটা একটা লম্বা
ছ চড়ছে। চড়তে চড়তে হঠাৎ পা
একেবারে – পপাত চ, মমার চ!
। হয়তো রাবণ ব্যাটা সত্যি সত্যিই
ছ – রাজস্বপ্ন মিথ্যা হয় না।
হবে না – হতে পারে না।
মানকে বললুম, 'যা, ব্যাটাকে সমুদ্রে
য়ে আয়।' হনুমান এসে বললে কি,
ও দরকার হল না – সে এক্কেবারে
।'
! – একদম মরে গেছে - ব্যস। আর
খুব ফুর্তি কর!

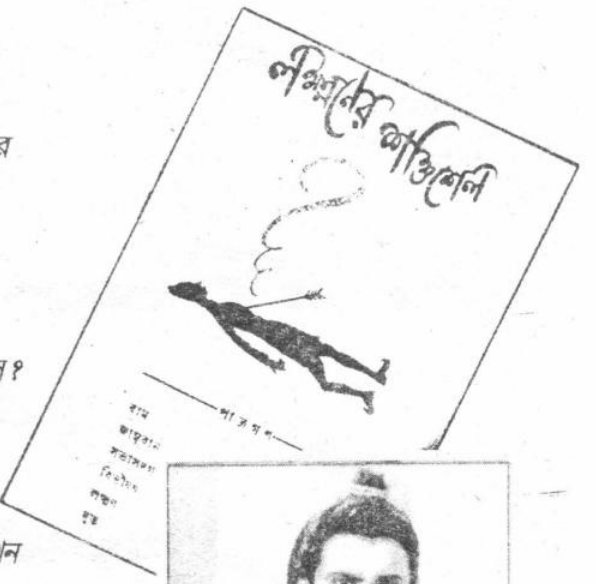

ঐ দেখ রাবণের রথ দেখা যাচ্ছে – দেখেছিস?
ঐটা রাবণ। ঐ যে লাঠি কাঁধে–
রাবণ ব্যাটা তবু মরেনি – ব্যাটার
জান্ তো খুব কড়া!
জাম্বুবান । এই হনুমান ব্যাটাই তো মাটি কললে–তখন
রাবণকে সমুদ্রে ফেলে দিলেই গোল চুকে
যেত -- না , ব্যাটা আবার বিদ্যে জাহির
করতে গিয়েছে – 'এক্কেবারে মরে গেছে'–
বিভীষণ । চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে–

[দূতের প্রবেশ]

সকলে । কি হে, খবর কি?
দূত । আজ্ঞে, আমি এইমাত্র আসছি –
লক্ষ্মণ । ব্যস! মস্ত খবর দিয়েছ আর কি!
জাম্বুবান । এইমাত্র আসছ? তোপ ফেলতে হবে?
রাম । আজ কি ঘটল না ঘটল সব ভালো করে গুছিয়ে
বল।

চিরাঙ্গত (লক্ষ্মণ)

রমেশ মুখোপাধ্যায় (জাম্বুবান),
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (রাম)

দূত । আজ্ঞে, আমি ছান টান করেই পুঁইশাকচচ্চড়ি
আর কুমড়ো ছেঁচকি দিয়ে চাট্টি ভাত খেয়েই
অমনি বেরিয়েছি — অবিশ্যি আজকে পাঁজিতে
কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ নিষেধ লিখেছিল, কিন্তু কি হল
জানেন? আমার কুমড়োটা পচে যাচ্ছিল কিনা —

সকলে। বাজে বকিসনে — কাজের কথা বল্।

দূত । হ্যাঁ-হ্যাঁ— খেয়ে উঠেই ঘন্টা দু-তিন জিরিয়ে
সেখানে গিয়ে দেখি খুব ঢাকঢোল বাজছে — ধ্যা
র‍্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা — ধ্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা —
ধ্যার‍্যা —

সকলে । মার — ব্যাটাকে মার - ব্যাটার কান কেটে দে।

জাম্বুবান । ব্যাটার ধ্যার‍্যার‍্যার‍্যা - চলেছে যেন
রেকারিং ডেসিমাল!

সুগ্রীব । ব্যাটা, তুই ভালো করে ধারাবাহিক রূপে
আদ্যোপান্ত পর্যায়পরম্পরা সব বলা কি কিনা?

রাম । তারপরে কি হল শুনি — ততঃ কিম্?

দূত । (গান) আসিছে রাবণ বাজে ঢক্ক ঢোল,
মহা ধুমধাম মহা হট্টগোল।

সকলে । ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্?

দূত । শঙ্খ হুলাহুলি সানাই নিঃস্বন
কর্তাল ঝঙ্কার অস্ত্রের ঝনন।

সকলে । ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্?

দূত । লাখো লাখো সৈন্য চলে সাথে সাথে
উড়িছে পতাকা সমুখে পশ্চাতে।

সকলে । ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্?

দূত । বীর দর্পে সবে করে কোলাহল
মহা আস্ফালনে কাঁপে ধরাতল।

সকলে । ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্?

দূত । তাহাদের রুদ্র দাপটের চোটে
ভয়ে প্রাণ উড়ে পিলে চমকে ওঠে।

সকলে । ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্?

দূত । আজি দুর্দিনেতে নাহি কারো রক্ষা।
দলে বলে সবে পাবি আজি অক্কা।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে উপেন্দ্রকিশোর তাঁর নিজের নামে একটি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেন। পরে এই প্রতিষ্ঠানের নাম হয় 'ইউ. রায় অ্যান্ড সন্‌স্'।

উপেন্দ্রকিশোর নিজে কখনো বিদেশ যাননি। কিন্তু সুকুমার যাতে বিলেতে গিয়ে ফটোগ্রাফি ও মুদ্রণের কাজ শিখে আসতে পারেন, এই বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে, তেইশ বছর বয়সে গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি নিয়ে সুকুমার ইংলন্ড যাত্রা করেন। তিনি প্রথমে লন্ডনে যান। 'লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিল স্কুল অফ ফটো এন্‌গ্রেভিং অ্যান্ড লিথোগ্রাফি'তে এক বছর শিক্ষালাভের পর ম্যান্‌চেস্টারে যান। সেখানে 'মিউনিসিপাল স্কুল অফ টেকনোলজি'তে ক্রোমোলিথোগ্রাফি ও লিথোর ড্রইং শিক্ষা করেন।

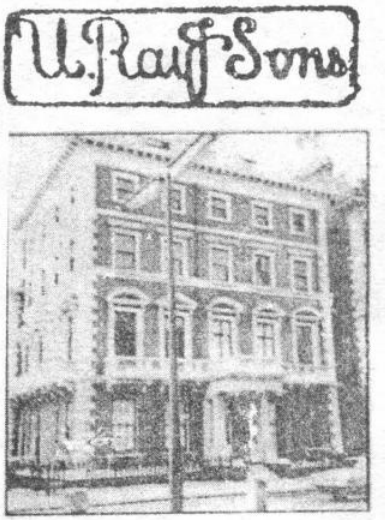

বিলেত থেকে উপেন্দ্রকিশোরকে লেখা চিঠিতে তাঁর কাজের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। উপেন্দ্রকিশোরের পুত্র হিসাবে তাঁর শিক্ষার পথ যে অনেকটা সহজ হয়ে গিয়েছিল, এ খবরও চিঠিতে জানা যায়।

উপরে: লন্ডনের ক্রমওয়েল রোডের এই বাড়িতে সুকুমার সবচেয়ে বেশিদিন থাকেন। ১৯৮৪ সালে সত্যজিৎ রায়ের তোলা পোলারয়েড ফটো

জাহাজ থেকে ভাই সুবিনয়কে লেখা পোস্টকার্ড। ৭ই অক্টোবর, ১৯১১

জাহাজ থেকে মা বিধুমুখীকে লেখা চিঠি

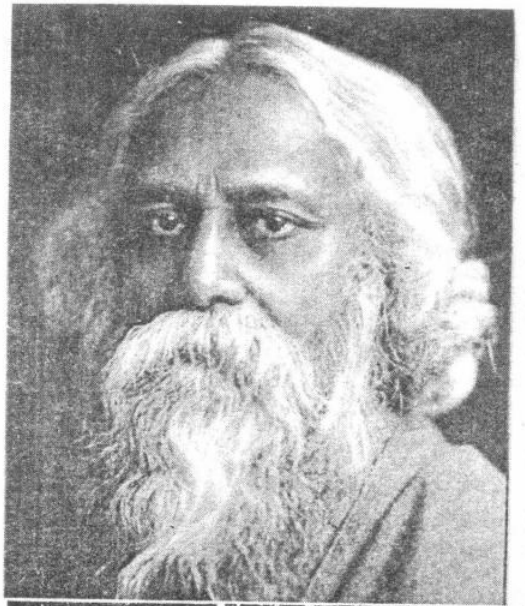

এই সময়ই, ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'র ইংরাজি অনুবাদ সঙ্গে করে লন্ডনে আসেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উপেন্দ্রকিশোরের সমসাময়িক ও বন্ধুস্থানীয়। ইংলন্ডে তখন বাঙালী ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ও অনুরাগী। তার মধ্যে সুকুমার ছিলেন অন্যতম। এ ছাড়া ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কেদারনাথ, আনন্দমোহন বসুর কনিষ্ঠ পুত্র অরবিন্দ, কালীমোহন ঘোষ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।

সেই সময় সুকুমার একটি সভায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইংরাজিতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ বিলাতের বিখ্যাত 'কোয়েস্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের সঙ্গে ইংরাজদের প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেয় এই প্রবন্ধ।

THE QUEST

A Quarterly Review.

Edited by G. R. S. Mead.

VOLUME V.
NUMBERS 1—4.

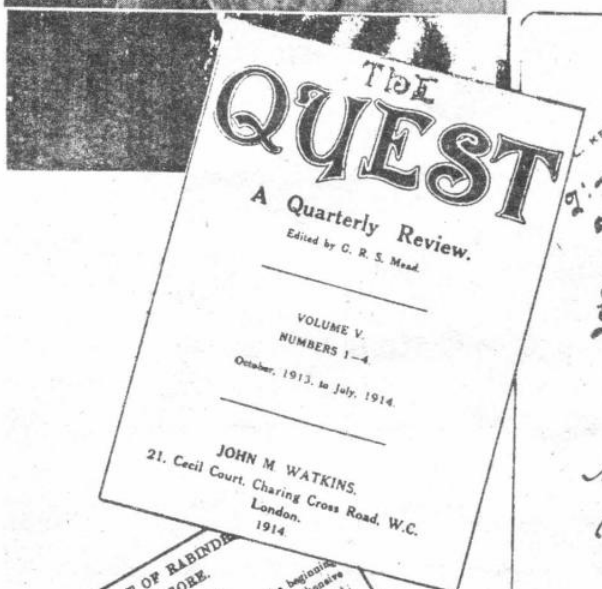

October, 1913, to July, 1914.

JOHN M. WATKINS.
21, Cecil Court, Charing Cross Road, W.C.
London.
1914.

THE SPIRIT OF RABINDR[ANATH] TAGORE.

SUKUMAR RAY.

I SHOULD like to make it clear from the beginning that I do not propose to attempt a comprehensive survey of the life and works of this illustrious poet; nor shall I be guilty of the presumption of attempting totally superfluous advertisement of his genius or personality. I shall content myself simply with reproducing, however imperfectly, what I consider to be the right background of thought and environment for a fruitful study of Rabindranath's poetical works, and with indicating briefly their high value not merely as an effective analysis of present-day problems in India and elsewhere, but as an exposition of the root-problems of life itself.

In the midst of all our work and all our pleasures, we are often unconscious that we are ever carrying with us the burden of an eternal question. Very few of us indeed have anything more than a vague consciousness of its existence, and most of us are satisfied with an occasional mild intellectual interest in the problem. But in some lives—and these lives alone are truly great—the question has assumed an imperative form; and wherever the demand for an answer has been thus insistent, we have had one of those contributions to human thought that leave a definite impression on the ever-changing ideals of humanity. In this paper we shall deal with some of

NORTHBROOK SOCIETY,
21, CROMWELL ROAD,
S.W.

২৫ জুলাই

তোর চিঠি পেয়েছি।

আজ এখানে একটা পার্টি আছে - Mrs. Naidu আসবেন। আমাদের সব নেমন্তন্ন হয়েছে।

গত সোমবার এখানে একটা সভায় (East & West Society তে) "The spirit of Rabindranath" বলে একটা paper পড়েছিলাম। লোকে মন্দ বলেনি - "Quest" কাগজের editor Mr. Mead (যিনি এখানে রবিবাবুর lecture সব arrange করেছিলেন) উনি সেটা 'Quest' কাগজে ছাপাবেন। রবিবাবু এক মাসের জন্য Nursing Home এ ছিলেন,

লন্ডন থেকে বোন শান্তিলতাকে লেখা চিঠি। ২৫শে জুলাই, ১৯১৩

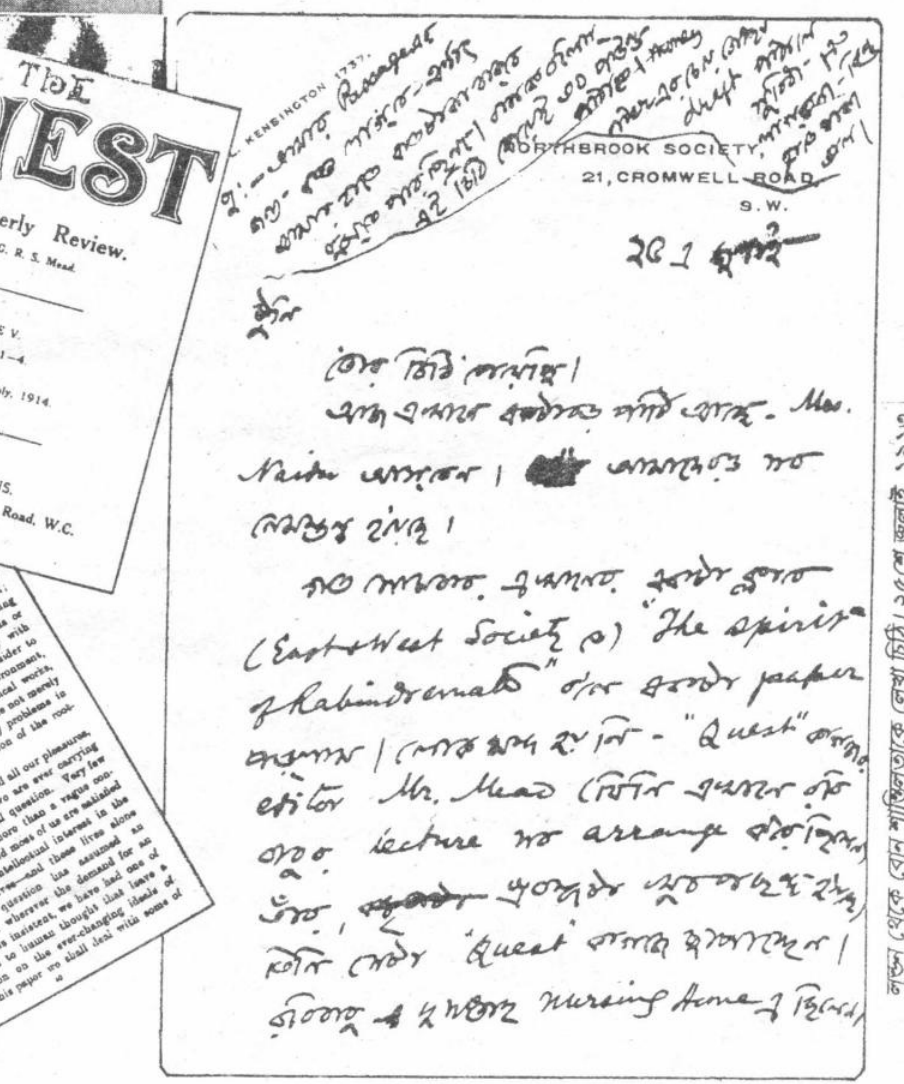

সুকুমার ও সুপ্রভা। বিয়ের পর স্টুডিওতে তোলা ফটো। ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯১৩

উপেন্দ্রকিশোরের 'সন্দেশ'

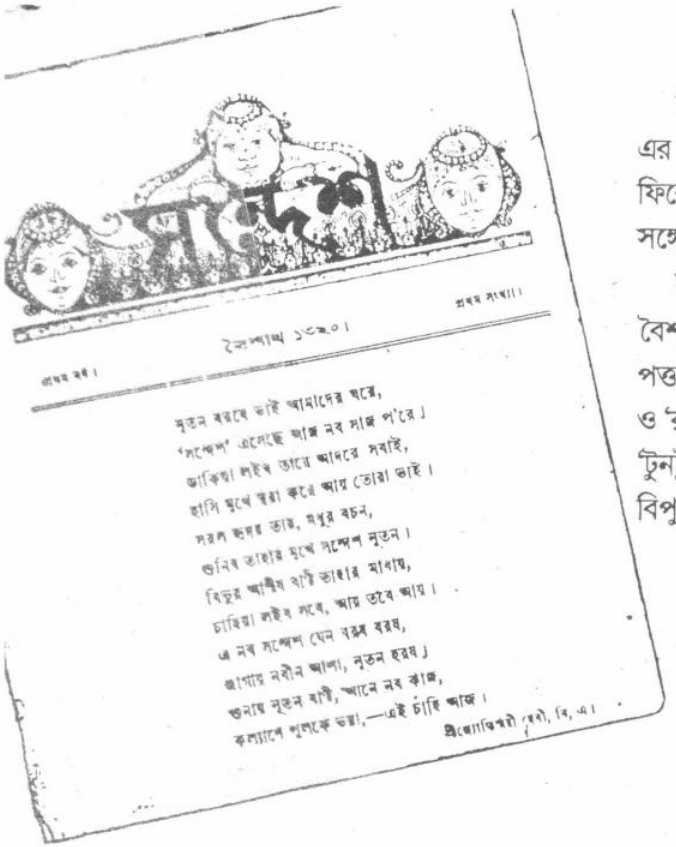

বিলাতে চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে, ব্রোঞ্জ-এর পদক লাভ করে, সুকুমার ১৯১৩র অক্টোবর মাসে দেশে ফিরে আসেন। তার দু'মাসের মধ্যে জগচ্চন্দ্র দাশের কন্যা সুপ্রভার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

সুকুমার যখন বিলেতে, তখনই উপেন্দ্রকিশোর ১৯১৩র বৈশাখে 'সন্দেশ' নামে শিশুদের জন্য একটি মাসিক পত্রিকার পত্তন করেন। 'সন্দেশ'এর আগেই উপেন্দ্রকিশোর 'মহাভারত' ও 'রামায়ণ'এর শিশুপাঠ্য সংস্করণ ও বাংলার উপকথার সংকলন 'টুনটুনির বই ' প্রকাশ করে শিশুসাহিত্যিক ও চিত্রকর হিসাবে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

'সন্দেশ'এর প্রথম সংখ্যার প্রথম পাতা। বৈশাখ ১৩২০

তথ্যচিত্র তোলার সময় ১০০ গড়পার রোডের বাড়ির ফটো। ১৯৮৭

১৯১৪ সালে উপেন্দ্রকিশোর সুকিয়া স্ট্রীট থেকে ১০০ নম্বর গড়পার রোডে সপরিবারে তাঁর নিজের বাড়িতে উঠে আসেন। এই বাড়ির সামনের অংশে ছিল মুদ্রণ কার্যের যাবতীয় ব্যবস্থা আর পিছনের দক্ষিণ অংশে ছিল বসতবাটি।

দুঃখের বিষয়, 'সন্দেশ' প্রকাশের দু'বছরের মধ্যেই উপেন্দ্র-কিশোর. পরলোকগমন করেন। কিন্তু এই দু'বছরে তিনি 'সন্দেশ'কে ছবি, গল্পে ও প্রবন্ধে ভরপুর করে রেখেছিলেন। মুদ্রণ শিল্পের নমুনা হিসেবেও 'সন্দেশ'এর কোনো তুলনা ছিল না।

পিতার মৃত্যুর পর 'সন্দেশ'এর সমস্ত ভার সুকুমার গ্রহণ করেন। 'সন্দেশ'এর জন্য সুকুমারের প্রথম রচনা ছিল 'খিচুড়ি' — যা পরে 'আবোল তাবোল'এ স্থান পায়। এরকম ছড়া এবং তার সঙ্গে এমন ছবি একমাত্র সুকুমারের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

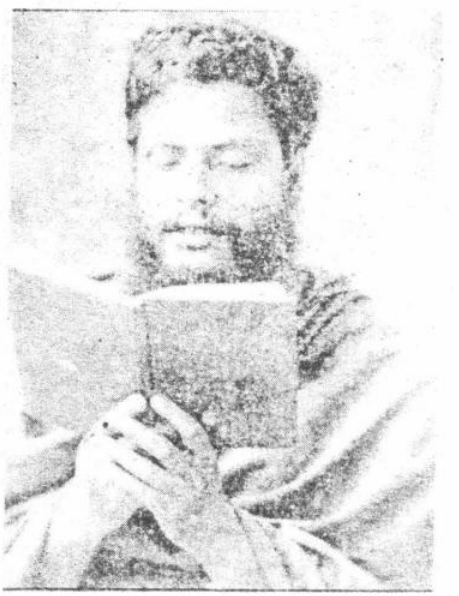

উপেন্দ্রকিশোর

হাঁস ছিল, সজারু, (ব্যাকরণ মানি না),
হয়ে গেল 'হাঁসজারু'কেমনে তা জানি না।
বক কহে কচ্ছপে— 'বাহবা কি ফুর্তি!
অতি খাসা আমাদের বকচ্ছপ মূর্তি।'

টিয়ামুখো গিরগিটি মনে ভারি শঙ্কা
পোকা ছেড়ে শেষে কিগো খাবে কাঁচা লঙ্কা?
ছাগলের পেটে ছিল না জানি কি ফন্দি,
চাপিল বিছার ঘাড়ে, ধড়ে মুড়ো সন্ধি!
জিরাফের সাধ নাই মাঠে ঘাটে ঘুরিতে,
ফড়িঙের ঢং ধরি' সেও চায় উড়িতে।
গরু বলে, 'আমারেও ধরিল কি ও রোগে?
মোর পিছে লাগে কেন হতভাগা মোরগে?'
হাতিমির দশা দেখ, — তিমি ভাবে জলে যাই,
হাতি বলে, 'এই বেলা জঙ্গলে চল ভাই।'
সিংহের শিং নেই, এই তার কষ্ট —
হরিণের সাথে মিলে শিং হল পষ্ট।

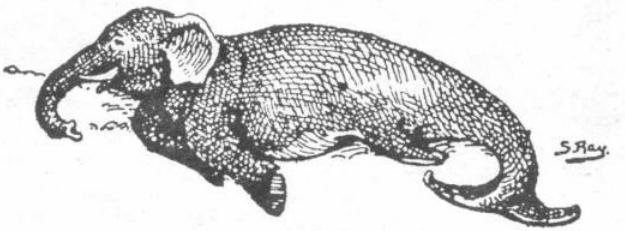

'সন্দেশ'এর যে উচ্চ আদর্শ উপেন্দ্রকিশোর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সুকুমারের আমলে তার কিছুমাত্র বিচ্যুতি ঘটেনি। সুকুমারের বড় বোন সুখলতা, মেজো বোন পূণ্যলতা, মেজো ভাই সুবিনয়, ছোট বোন শান্তিলতা ও কাকা কুলদারঞ্জন — সকলেই সুকুমারের পাশে এসে দাঁড়ান। এ ছাড়া অন্য নামী লেখকও 'সন্দেশ'এর জন্য লিখেছেন। তবে অধিকাংশ ছবি এবং রচনাই ছিল সুকুমারের নিজের।

সুকুমারের যে কত বিষয়ে কৌতূহল ছিল, তার নমুনা পাওয়া যায় একটি খেরোর খাতায়— যার সাত রকম নামকরণ করেছিলেন সুকুমার। এই চিচিত্র খাতা নানান দিক দিয়ে সুকুমারের পরিচয় বহন করে।

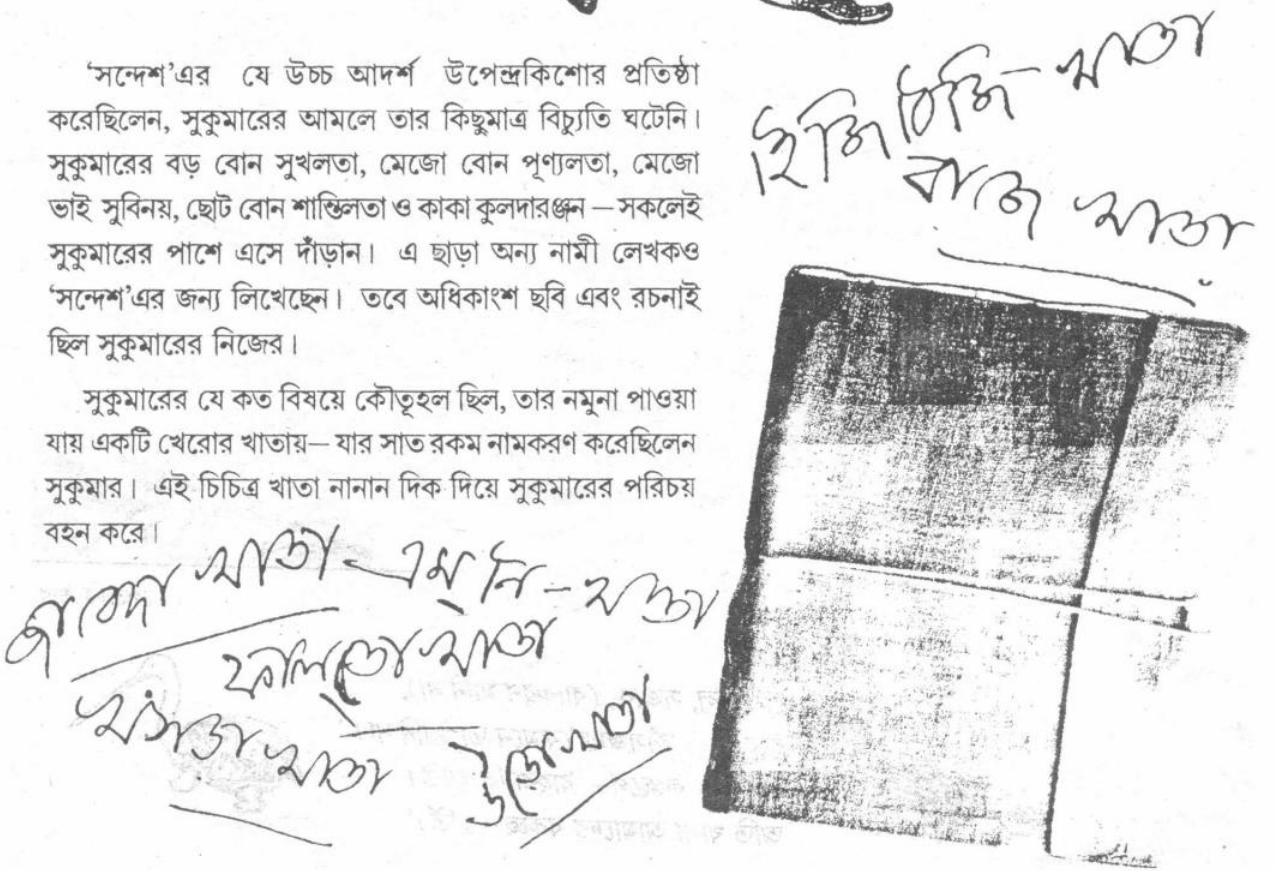

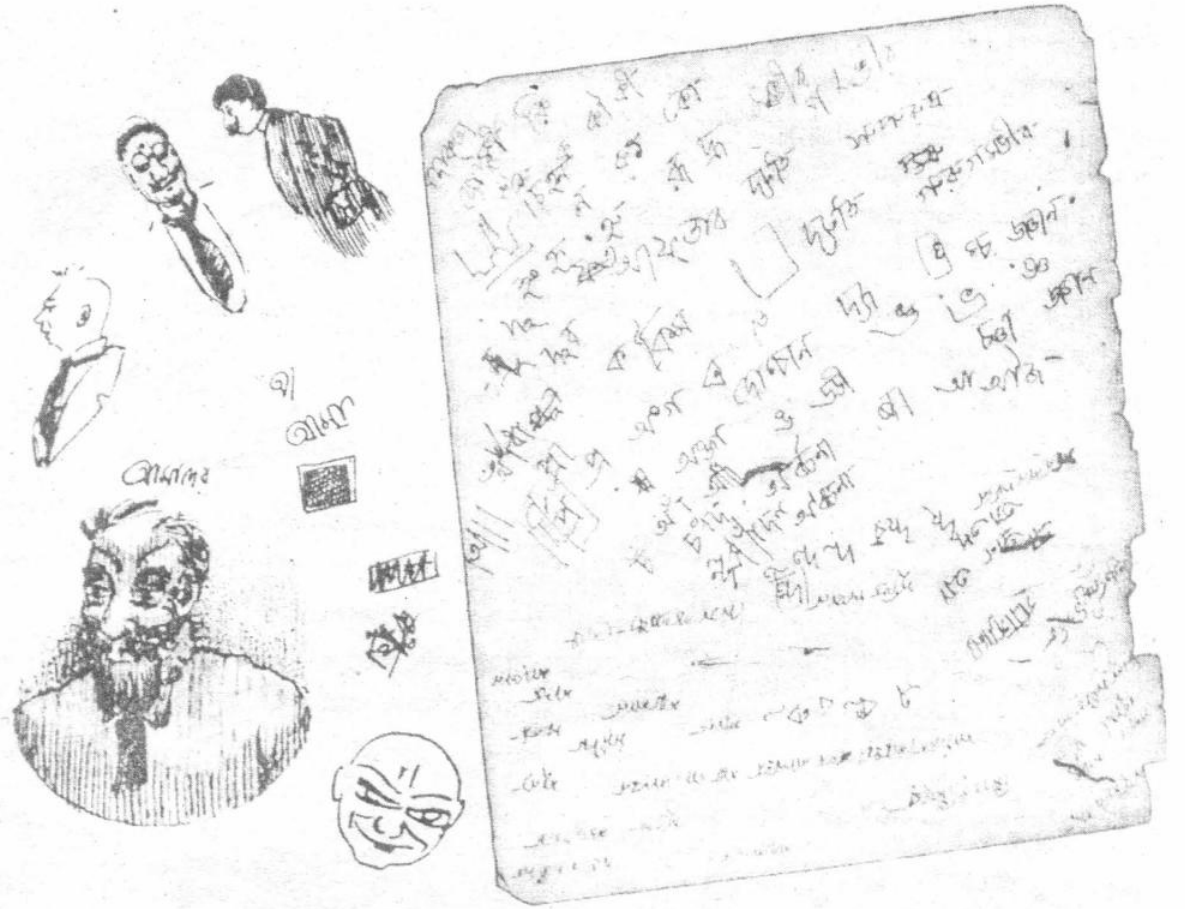

খেরোর খাতায় সুকুমারের হরফ সংস্কারের নমুনা ও কিছু স্কেচ

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

'সন্দেশ'এর বাইরেও সুকুমারের কাজ ছিল। প্রথমত, তিনি ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যুবসমিতির সংগঠক ও মধ্যমণি-স্বরূপ।

রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মাননীয় সভ্য হিসাবে নির্বাচন করা হবে কি না, তাই নিয়ে সমাজের প্রবীন কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে তরুণদের একটা বিবাদের সৃষ্টি হয়। সুকুমার ও তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। প্রশান্তচন্দ্র এ বিষয়ে একটি পুস্তিকা রচনা করেন, যাতে তিনি নানান যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করেন কেন রবীন্দ্রনাথকে নির্বাচন করা উচিত। অবশেষে গণভোটে তরুণদেরই জয় হয়।

সমাজ ছাড়াও সুকুমারের একটি বড় কাজ ছিল। ১৯১৫ সালে তিনি একটি সংস্থার পত্তন করেন। এর বাংলা নাম 'মণ্ডা-সম্মিলন' —ইংরিজি 'মান্ডে ক্লাব।'

সুকুমারের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে অনেক প্রতিভাবান তরুণ এই ক্লাবের সভ্য হন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য — কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী, অতুলপ্রসাদ সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালীদাস নাগ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, হিরণকুমার সান্যাল ইত্যাদি।

এই ক্লবের আমন্ত্রণপত্র সুকুমার নিজেই রচনা করতেন এবং ছাপা হত 'ইউ. রায় অ্যান্ড সন্‌স্'এ। অধিকাংশ আমন্ত্রণই ছিল পদ্যে, তার মধ্যে একটির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

সম্পাদক বেয়াকুব'
কোথা যে দিয়েছে ডুব
এদিকেতে হায় হায়
ক্লাবটিত যায় যায় !

তাই বলি, সোমবারে
মদ্‌গৃহে গড়পারে
দিলে সবে পদধূলি
ক্লাবটিরে ঠেলে তুলি

রকমারি পুঁথি কত
নিজ নিজ রুচিমত
আনিবেন সাথে সবে
কিছু কিছু পাঠ হবে।

করযোড়ে বার বার
নিবেদিছে সুকুমার

ক্লাবের কর্মসূচি থেকে জানা যায় এখানে নানারকম গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা, রাজনীতি— কানোটাই বাদ পড়ত না।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'আমাদের শান্তিনিকেতন'এর সুরে 'আমাদের মঞ্জ-সম্মিলন' নামে একটি গান রচনা করেন। সত্যেন্দ্র-নাথ বলেছেন—

মোদের গানের বিপুল বেগে
পাড়া আঁৎকে ওঠে জেগে,
ঢিল ছুড়িতে সুরু করে বেজায় রেগেমেগে।
মোদের নাচ যদি পায়, তবে
কি যে হয় শোনো তা সবে,—
নাগ বাসুকীর ঘাড় খচে যায়, হয় ভূমিকম্পন !

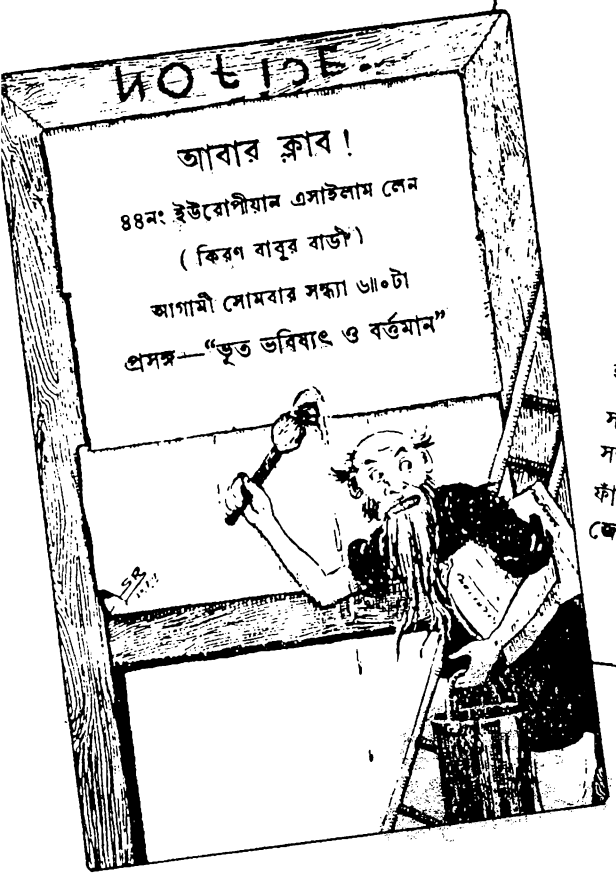

সরবৎ সম্মিলন

শনিবার ১৭ই,
সাড়ে-পাঁচ বেলা,
গড়পারে হৈহৈ
সরবতী মেলা।

অতএব ঘড়ি ধ'রে—
সাবকাশ হ'য়ে,
আসবেন দয়া ক'রে
হাসিমুখ ল'য়ে।

সরবৎ, সদালাপ,
সঙ্গীত-ভীতি—
ফাঁকি দিলে নাহি মাপ,
জেনে রাখ—ইতি

প্রতিবাদ সভা

সম্প্রতি ক্লাবের সর্ব্বজনস্বীকৃত সম্পাদকরূপে আমি "অধিকারী" উপাধি গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে কোন কোন ঈর্ষ্যাপরায়ণ "সভ্য" অসঙ্গতভাবে আপত্তি করিতেছেন। কালিদাস বাবু আপত্তি করিতে চান করুন, কিন্তু আমি স্বোপার্জ্জিত উপাধি ছাড়িব না।

এই প্রকার অন্যায় আপত্তির বিশেষ প্রতিবাদ বাঞ্ছনীয়। অনেক হিসাব করিয়া দেখিলাম, আগামী মঙ্গলবার ২১শে আগষ্ট, বাংলা তারিখ জানি না, আমাদের ক্লাবের জন্মদিন, অর্থাৎ প্রায় জন্মদিন। ঐ দিনই সন্ধ্যার সময় ১০০ নং গড়পার রোড, অর্থাৎ কাশাবোবা ইস্কুলের পশ্চাতে, সুকুমার বাবু নামক ক্লাবের একজন আদিম ও প্রাচীন সভ্যের বাড়ীতে সভার আয়োজন হইয়াছে। বক্তা প্রায় সকলেই, সভাপতি আপনি, বিষয়ও গম্ভীর—সুতরাং খুব অধিয়ার সম্ভাবনা।

আসিবার সময় একখানা সেকেণ্ডক্লাশ গাড়ী সঙ্গে আনিবেন—আমায় ফিরিবার পথে নামাইয়া দিতে হইবে; খাওয়া গুরুতর হইবার আশঙ্কা আছে। ইতি

শশব্যস্ত
শ্রীশিশিরকুমার দত্তাধিকারী
সুযোগ্য সম্পাদক।

সুকুমার রচিত 'মণ্ডা-ক্লাব'এর কয়েকটি আমন্ত্রণপত্র

"খায় ত খায়"

ANNUAL MEETING

Monday September 2, 1918, at 6-30 p.m.

100, GURPAR ROAD

AGENDA OF BUSINESS:

1. *The Secretary to present his annnal mis-statements.*
2. *Prof Siddhanta to move: "To adopt or not to adopt—that is the question."*
3. *Jibon Babu to protest: "Is this a report? If so, why not?"*
4. *Khodan Babu to propose: "That in the interest of plain living and high thinking, tea and biscuits—" [Loud disturbance]*
5. *Storm of protests—chorus led by Jungli Babu.*

GOD SAVE THE SECRETARY

এই সময়ই সুকুমার বড়দের জন্য দু'টি নাটক রচনা করেন। একটি হল 'চলচিত্তচঞ্চরী', অন্যটি হল 'শব্দকল্পদ্রুম'।

১৯২১ সালে সুকুমারের যখন ৩৩ বছর বয়স, তখন তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তার রোগ নির্ণয় করে বোঝেন — কালাজ্বর।

সেই বছরেই সুপ্রভার একটি পুত্রসন্তান জন্মায়, যার নামকরণ হয় সত্যজিৎ।

সুকুমার এই অসুখের মধ্যেই 'সন্দেশ'এর জন্য লেখা এবং আঁকার কাজ চালিয়ে যান। 'হ য ব র ল' এই সময়েরই রচনা। সুকুমারের হাস্যরসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই খাঁটি বাংলা রচনাটির প্রেরণা এসেছিল লুইস ক্যারলের 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যাণ্ড' থেকে। 'হ য ব র ল'র জগৎ হল স্বপ্নের জগৎ—

তথ্যচিত্রে 'হ য ব র ল'। সম্বর্ত সরকার (আমি) ও সন্তোষ দত্ত (বুড়ো)

সুকুমারের আঁকা গল্পের বুড়ো

তারপর বুড়ো জিগগেস করল, 'ওজন কত?'

আমি বললাম, 'জানি না।'

বুড়ো তার দুটো আঙুল দিয়ে আমায় একটুখানি টিপে-টিপে বলল, 'আড়াই সের।'

আমি বললাম, 'সেকি, পটলার ওজনই তো একুশ সের, সে আমার চাইতে দেড় বছরের ছোট।'

কাকটা অমনি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'সে তোমাদের হিসেব অন্য রকম।'

বুড়ো বলল, 'তাহলে লিখে নাও— ওজন আড়াই সের, বয়েস সাঁইত্রিশ।'

আমি বললাম, 'দূৎ! আমার বয়স হল আট বছর তিন মাস, বলে কিনা সাঁইত্রিশ।'

বুড়ো খানিকক্ষণ কি যেন ভেবে জিগগেস করল, 'বাড়তি না কমতি?'

আমি বললাম, 'সে আবার কি?'

বুড়ো বলল, 'বলি বয়েসটা এখন বাড়ছে না কমছে?'

আমি বললাম, 'বয়েস আবার কমবে কি?'

বুড়ো বলল, 'তা নয় তো কেবলি বেড়ে চলবে নাকি? তাহলেই তো গেছি! কোনদিন দেখবো বয়েস বাড়তে-বাড়তে একেবারে ষাট সত্তর আশি বছর পার হয়ে গেছে। শেষটায় বুড়ো হয়ে মরি আর কি!'

আমি বললাম, 'তা তো হবেই। আশি বছর বয়েস হলে মানুষ বুড়ো হবে না!'

বুড়ো বলল, 'তোমার যেমন বুদ্ধি! আশি বছর বয়েস হবে কেন? চল্লিশ বছর হলেই আমরা বয়েস ঘুরিয়ে দিই। তখন আর একচল্লিশ, বেয়াল্লিশ হয় না— উনচল্লিশ, আটত্রিশ, সাঁইত্রিশ করে বয়েস নামতে থাকে। এমনি করে যখন দশ পর্যন্ত নামে তখন আবার বয়েস বাড়তে দেওয়া হয়। আমার বয়েস তো কত উঠল নামল আবার উঠল, এখন আমার বয়েস হয়েছে তেরো।'

গল্পের কাক—
সত্যজিৎ রায়ের ডিজাইন করা
তথ্যচিত্রের কাক

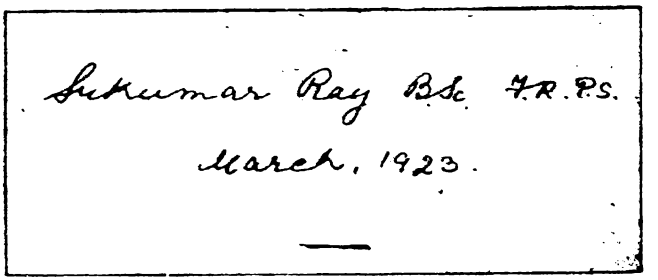

একটি খসড়া খাতার
প্রথম পাতা

১৯২২ সালে অসুখের মধ্যেই সুকুমার 'ফেলো অফ দ্য রয়েল ফটোগ্রাফিক সোসাইটি' নির্বাচিত হন। ১৯২৩এ প্রকাশিত হয় ছোটদের জন্য পদ্যে লেখা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস 'অতীতের ছবি'।

সুকুমারের অবস্থা তখন খারাপের দিকে, কিন্তু লেখার বিরতি নেই —মুদ্রণ শিল্প সম্বন্ধে নোট লেখা চলেছে। একটি খসড়া খাতায় বর্ণমালাতত্ত্ব নামে একটি অনুপ্রাসকেন্দ্রিক কাব্য টুকরো টুকরো ভাবে লেখা হয়ে চলেছে। পদ্যে মহাভারত লিখতে শুরু করেছেন ছোটদের জন্যে। একবার সোদপুরে হাওয়া বদল করতে গিয়ে সূর্যাস্তে গঙ্গার একটি রঙীন ছবি এঁকেছেন।

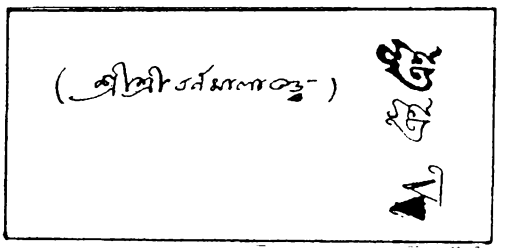

পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতা

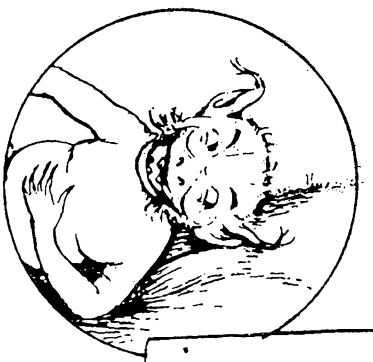

'হ য ব র ল' বই আগেই বেরিয়েছে। 'আবোল তাবোল'এর জন্য একটি ডামি কপি করেছেন, যার থেকে বইয়ের চেহারা কিরকম হবে তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। বইয়ের রঙীন মলাটও আঁকা হয়ে গেছে।

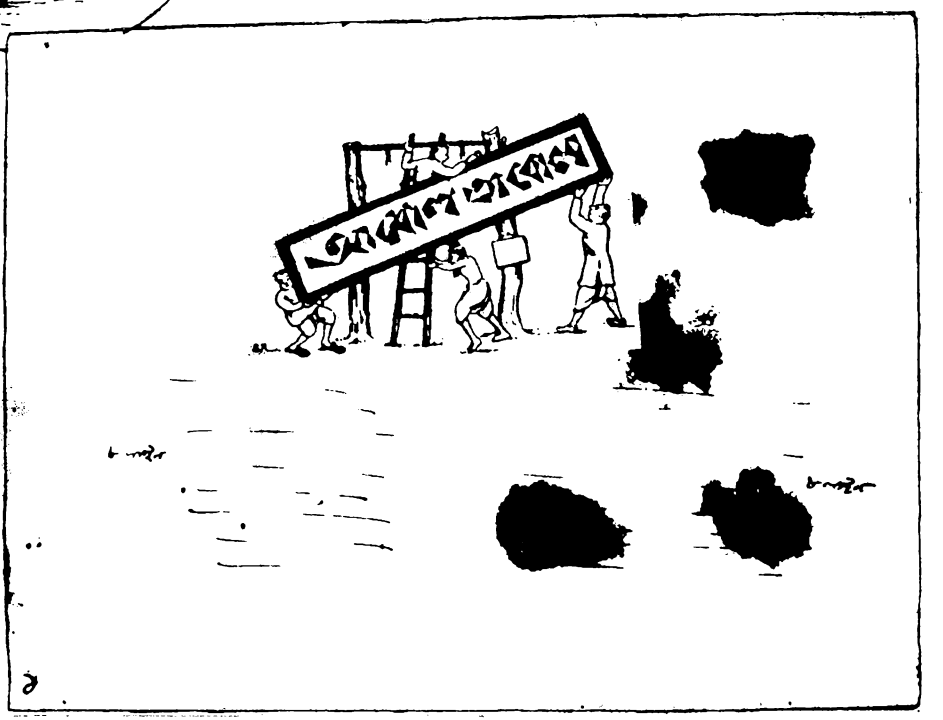

ডামি কপির প্রথম পাতা

ছাপা অবস্থায় 'আবোল তাবোল' সুকুমার দেখে যেতে পারেননি। 'আবোল তাবোল'এর শেষ কবিতায় তিনি স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি আর বেশিদিন ইহজগতে নেই। এতে তিনি বলেছেন—

'আজকে দাদা যাবার আগে
বল্‌ব যা মোর চিত্তে লাগে—
নাই বা তাহার অর্থ হোক্
নাই বা বুঝুক বেবাক্ লোক।
আপনাকে আজ আপন হতে
ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে।
ছুট্‌লে কথা থামায় কে?
আজকে ঠেকায় আমায় কে?'

আর শেষ দুটি পংক্তি হল—

'ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর,
গানের পালা সাঙ্গ মোর।'

সুকুমারের রোগের শেষ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখতে এসে গান শুনিয়ে গিয়েছিলেন।

১৯২৩এর ১০ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় ভূমিকম্প হয়। সেই দিনই সকালে, আড়াই বছর কঠিন রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করে, ৩৬ বছর বয়সে সুকুমার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

সুকুমারের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে একটি ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন—

আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি কিন্তু এই
অল্প বয়স্ক যুবকটির মত, অল্প কালের আয়ুটিকে
নিয়ে, মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে
অমৃতময় পুরুষকে অর্ঘ্যদান করতে প্রায় আর
কাউকে দেখিনি। মৃত্যুর দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে
অসীম জীবনের জয়গান তিনি গাইলেন।
তাঁর রোগশয্যার পাশে বসে সেই গানের সুধাটিতে আমার
চিত্ত পূর্ণ হয়েচে।

জীবন সর্দার

চারপাশের সবকিছুর সাথে তার কি সম্পর্ক, সে কথাটা মানুষ যে দিন বুঝতে পেরেছে, সেদিন থেকেই সে প্রকৃতি-পড়ুয়া। তার আগে, মাটি খুঁড়ে, মূল তুলে, গাছ থেকে ফল পেড়ে, মাছ ধরে, শিকার করে, কত না উপায়ে চার পাশ থেকে আদায় করে নিত তার দরকারের সব জিনিস। তখন দরকার ছিল অল্পকিছু আর খুবই সরল—তেষ্টার জল, নিশ্বাসের হাওয়া, আর খিদে মেটাবার একটু খাবার। যে বুদ্ধির জোরে সে বুঝতে পেরেছিল চারপাশের সাথে তার কি সম্পর্ক, সেই বুদ্ধিই তাকে, অল্প প্রয়োজনে ও অল্প আয়াসে বেশি আদায় করে নেবার কায়দা দেখিয়ে দিল একদিন। তারপর থেকে, মাটি, জল, হাওয়া সবখানেই সে রাজা হয়ে বসেছে। প্রকৃতিকে কব্জা করে, তাকে বশ মানানোর নেশা পেয়ে গেল তার। তাই যত গণ্ডগোল।

প্রথম গণ্ডগোল হাওয়া নিয়ে : মানুষের কারবারে হাওয়ায় এখন সেই জিনিসটার টান পড়েছে যা না হলে প্রাণ বাঁচে না। পরের গণ্ডগোল জল নিয়ে। হাওয়ার মতো জলেও মলিনতা বেড়েছে শুধু অবুঝের মতো তার ব্যবহারে। আরও দেখ, যে মাটির উপর প্রাণী আর সবুজ প্রকৃতি পুরো নির্ভর, সেই 'সবুজ' আজ মাটির বুক থেকে মুছে যাবার পথে এসে পৌঁছেছে। ঠিক এখনই, প্রয়োজনের মুহূর্তে, আদিকালের জানা কথাগুলো মনে পড়ে গেল! চারপাশের সাথে তার সম্পর্ক কী—ফের খুঁজে বুঝে নেয়া শুরু হয়েছে। আমরাও তাতে সামিল হয়েছি—আমরা প্রকৃতি-পড়ুয়া

আমাদের কাজ মাঠে বনে ঘুরে ঘুরে প্রকৃতির রূপগুণে তত্ত্ব তালাস করা। প্রাণী ও উদ্ভিদের সম্পর্ক বোঝা। 'সন্দেশ'এর গ্রাহক ও পাঠক যার মনেই প্রকৃতিকে জানার ঝোঁক রয়েছে, ভালোবাসা রয়েছে, তাকেই এই দলে যোগ দিতে ডাক দিচ্ছি।

****

❑ প্রকৃতি পড়ুয়ার পাঠশালা 'সন্দেশ' কার্যালয়ে প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম রোববার বিকেল চারটেতে।

❑ প্রকৃতিকে জানার এমন পাঠশালা এই দেশে এটাই প্রথম।

****

দিলীপকুমার গুপ্তকে লেখা চিঠি

জীবনানন্দ দাশ

সর্বানন্দ ভবন
বরিশাল
৩০.১০.৪৩

প্রীতিভাজনেষু,

স্বর্গগত কবি সুকুমার রায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে স্মৃতিসভায় যোগদান করবার নিমন্ত্রণপত্র পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছি। আপনারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভকামনা জানবেন।

কবি সুকুমার রায়ের রচনার অনুকরণীয় বৈশিষ্ট্য শিশুকাল থেকে আমাকে টেনেছে। শৈশবে, বাল্যে—এমন কি প্রথম যৌবনে যে সব কবি ও সাহিত্যিকদের লেখা আমার ভালো লাগত, তাঁদের অনেকেরই রচনা সম্পর্কে আগেকার সেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু সুকুমার রায়ের লেখা—প্রধানতঃ তাঁর কবিতা—বিশেষ করে তাঁর 'আবোল তাবোল' বইটি সম্বন্ধে আমার এবং আশা করি প্রায় সকলেরই আগ্রহ এখনও প্রচুর। বইখানি বিশেষ কোনও সময়ে সৃষ্টি হয়েও সময়োত্তীর্ণ বিশেষত্বে প্রদীপ্ত।

আমাদের এই পৃথিবীর ভিতরেই আরও অনেক পৃথিবী রয়েছে যেন। সাধারণ চোখ দিয়ে স্বভাবত তা খুঁজে পাওয়া যাবে এমন নয়। থাকে তা সৃষ্টিপরায়ণ মানসের ভিতর; এঁরাই আমাদের দেখান। সেই সব পৃথিবীর ভিতর কোনওটা যেন এই জগতেরই তীব্র স্বচ্ছ মুকুরের মত, কোনওটা কিছু কুয়াশাচ্ছন্ন অথবা বিদ্যুতায়িত; এই রকম এবং আরও অনেক রকম। কিন্তু সুকুমার রায়ের পৃথিবী—'আবোল তাবোল'-এ যা সত্য হয়ে ফলে উঠেছে তা মোটেই আমাদের চেনাজানা পৃথিবী কিংবা তার প্রতিচ্ছবির মতো বাস্তব না হয়েও তেমনি পরিচিত ও তেমনি সত্য। এইখানেই কবির সাদাসিদে ভাবে সে এক অনন্যসাধারণ শক্তি; আমি কোনও স্বদেশী বা বিদেশী সাহিত্যিকের লেখায় ঠিক এই ধরনের প্রতিভার পরিচয় পাইনি! সুকুমার রায়ের এই স্বকীয়তার কথা যতই ভাবা যায় ততই বিস্ময়ে ও আনন্দে স্তব্ধ হয়ে থাকতে হয়।

আপনাদের আমন্ত্রণলিপি যখন এখানে এসেছে তখন আমি বরিশালে ছিলাম না। এখানে এসে কাল আপনাদের চিঠি দেখলাম। এখন আর সময় কুলোবে না, অল্পের জন্য কবির স্মৃতিসভায় উপস্থিত থাকতে না পারায় আমি এত বেশী দুঃখিত যে, কবির আগামী জন্মতিথি উপলক্ষে স্মৃতিসভায় আমাকে ডাকতে ভুলবেন না আপনাদের কাছে এই আমার একান্ত অনুরোধ।

প্রীতি নমস্কার।

ইতি
জীবনানন্দ দাশ

হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী

সুকুমার রায়

প্রফেসর হুঁশিয়ার আমাদের উপর ভারি রাগ করেছেন। আমরা সন্দেশে সেকালের জীবজন্তু সম্বন্ধে নানা কথা ছাপিয়েছি ; কিন্তু কোথাও তাঁর অদ্ভুত শিকার কাহিনীর কোনও উল্লেখ করিনি। সত্যি, এ আমাদের ভারি অন্যায়। আমরা সে সব কাহিনী কিছুই জানতাম না, কিন্তু প্রফেসর হুঁশিয়ার তাঁর শিকারের ডায়েরী থেকে কিছু কিছু উদ্ধার করে আমাদের পাঠিয়েছেন। আমরা তারই কিছু কিছু ছাপিয়ে দিলাম। এসব সত্যি কি মিথ্যা তা তোমরা বিচার করে নিও।

২৬শে জুন ১৯২২ — কারাকোরাম্, বন্দাকুশ পাহাড়ের দশ মাইল উত্তর। আমরা এখন সবসুদ্ধ দশজন--আমি, আমার ভাগ্নে চন্দ্রখাই, দুজন শিকারী (ছক্কড় সিং আর লক্কড় সিং) আর ছয়জন কুলি। আমার কুকুরটাও সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে।

নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়ে জিনিসপত্র সব কুলিদের জিম্মায় দিয়ে, আমি চন্দ্রখাই আর শিকারী দুজন সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে বন্দুক, ম্যাপ, আর একটা মস্ত বাক্স, তাতে আমাদের যন্ত্রপাতি আর খাবার জিনিস।

হেশোরাম হুঁশিয়ার ও দলবল

দু ঘন্টা পথ চলে আমরা এক জায়গায় এলাম; সেখানকার সবই কেমন অদ্ভুত রকম। বড় বড় গাছ, তার একটারও নাম আমরা জানি না। একটা গাছে প্রকান্ড বেলের মতো মস্ত মস্ত লাল রঙের ফল ঝুলছে; একটা ফুলের গাছ দেখলাম—তাতে হলদে সাদা ফুল হয়েছে —এক-একটা দেড় হাত লম্বা। আর-একটা গাছে ঝিঙের মতো কী-সব ঝুলছে, পঁচিশ হাত দূর থেকে তার ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যায়। আমরা অবাক হয়ে এই সব দেখছি, এমন সময় হঠাৎ হুপ্‌হাপ্ গুব্‌গাব্ শব্দে পাহাড়ের উপর থেকে ভয়ানক একটা কোলাহল শোনা গেল।

আমি আর শিকারী দু'জন তৎক্ষণাৎ বন্দুক নিয়ে খাড়া; কিন্তু চন্দ্রখাই বাক্স থেকে দুই টিন জ্যাম বের করে নিশ্চিন্তে বসে খেতে লাগল। ওইটে তার একটা মস্ত দোষ; খাওয়া পেলে তার বিপদ-আপদ কিছুই জ্ঞান থাকে না। এইভাবে প্রায় মিনিট দুই দাঁড়িয়ে থাকবার পর লক্কড় সিং হঠাৎ দেখতে পেল হাতির চাইতেও বড় কী একটা জন্তু গাছের উপর থেকে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। প্রথমে দেখে মনে হল একটা প্রকাণ্ড মানুষ, তারপর মনে হল মানুষ নয় বাঁদর, তারপর দেখি, মানুষও নয়, বাঁদরও নয়—একেবারে নতুন রকমের জন্তু। সে লাল লাল ফলগুলোর খোসা ছাড়িয়ে খাচ্ছে আর আমাদের দিকে ফিরে ফিরে ঠিক মানুষের মতো হাসছে। দেখতে দেখতে পঁচিশ-ত্রিশটা ফল টপাটপ খেয়ে শেষ করল। আমরা এই সুযোগে তার কয়েকখানা ছবি তুলে ফেললাম। তার পর চন্দ্রখাই ভরসা করে এগিয়ে তাকে কিছু খাবার দিয়ে আস্‌ল। জন্তুটা মহা খুশী হয়ে এক গ্রাসে আস্ত একখানা পাঁউরুটি আর প্রায় আধ সের গুড় শেষ করে, তারপর পাঁচ-সাতটা সিদ্ধ ডিম খোলাসুদ্ধ কড়মড়িয়ে খেয়ে ফেলল। একটা টিনে করে গুড় দেওয়া হয়েছিল, সেই টিনটাও সে খাবার মতলব করেছিল, কিন্তু খানিকক্ষণ চিবিয়ে হঠাৎ বিশ্রী মুখ করে সে কান্নার সুরে গাঁও গাঁও শব্দে বিকট চিৎকার করে জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। আমি জন্তুটার নাম দিয়েছি হ্যাংলাথেরিয়াম।

২৪শে জুলাই, ১৯২২—বন্দাকুশ পাহাড়ের একুশ মাইল উত্তর। এখানে এত দেখবার জিনিস আছে, নতুন নতুন এত সব গাছপালা জীবজন্তু, যে তারই সন্ধান করতে আর নমুনা সংগ্রহ করতে আমাদের সময় কেটে যাচ্ছে। দু'শো রকম পোকা আর প্রজাপতি, আর পাঁচশো রকম গাছপালা ফুলফল সংগ্রহ করেছি; আর ছবি যে কত তুলেছি তার সংখ্যাই হয় না। একটা কোন জ্যান্ত জানোয়ার ধরে সঙ্গে নেবার ইচ্ছা আছে, দেখা যাক কতদূর কী হয়। সেবার যখন কটক টোডন্ আমায় তাড়া করেছিল, তখন সে কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। এবার তাই জলজ্যান্ত প্রমাণ সংগ্রহ করে নিচ্ছি।

আমরা যখন বন্দাকুশ পাহাড়ে উঠেছিলাম, তখন পাহাড়টা কত উঁচু তা মাপা হয়নি। সেদিন জরিপের যন্ত্র দিয়ে আমি আর চন্দ্রখাই পাহাড়টাকে মেপে দেখলাম। আমার হিসাবে হল ষোল হাজার ফুট কিন্তু চন্দ্রখাই হিসাব করল বেয়াল্লিশ হাজার। তাই আজ আবার সাবধানে দু'জনে মিলে মেপে দেখলাম, এবার হল মোটে দু'হাজার সাতশো ফুট। বোধহয় আমাদের যন্ত্রে কোনও দোষ হয়ে থাকবে। যা হোক, এটা নিশ্চয়ই যে এ পর্যন্ত ঐ পাহাড়ের চুড়োয় আর কেউ ওঠেনি। এ এক সম্পূর্ণ অজানা দেশ, কোথাও জনমানুষের চিহ্নমাত্র নাই, নিজেদের ম্যাপ নিজেরা তৈরি করে পথ চলতে হয়।

আজ সকালে এক কাণ্ড হয়ে গেছে। লক্কড় সিং একটা গাছে হলদে রঙের ফল ফলেছে দেখে তারই একটুখানি খেতে গিয়েছিল। এক কামড় খেতেই হঠাৎ হাত-পা খিঁচিয়ে সে আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগল। তাই দেখে ছক্কড় সিং 'ভাইয়া রে, ভাইয়া' বলে কেঁদে অস্থির। যা হোক, মিনিট দশেক ঐ রকম হাত-পা ছুঁড়ে লক্কড় সিং একটু ঠাণ্ডা হয়ে উঠে বসল। তখন আমাদের চোখে পড়ল যে একটা জন্তু কাছেই ঝোপের আড়াল থেকে অত্যন্ত বিরক্ত মতন মুখ করে

হ্যাংলাথেরিয়াম

আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চেহারা দেখলে মনে হয় যে, সংসারে তার কোন সুখ নেই, এসব গোলমাল কান্নাকাটি কিছুই তার পছন্দ হচ্ছে না। আমি তার নাম দিয়েছি গোম্‌রাথেরিয়াম। এমন খিট্‌খিটে খুঁতখুঁতে গোমরা মেজাজের জন্তু আমরা আর দ্বিতীয় দেখিনি। আমরা তাকে তোয়াজ-টোয়াজ করে খাবার দিয়ে ভোলবার চেষ্টা করেছিলাম। সে অত্যন্ত বিশ্রীমতো মুখ করে, ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে অনেক আপত্তি জানিয়ে, আধখানা পাঁউরুটি আর দুটো কলা খেয়ে তারপর একটুখানি পেয়ারার জেলি মুখে দিতেই এমন চটে গেল যে রেগে সারা গায়ে জেলি আর মাখন মাখিয়ে আমাদের দিকে পিছন ফিরে মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগল।

১৪ই আগস্ট, বন্দাকুশ পাহাড়ের পাঁচিশ মাইল উত্তর। --ট্যাপ্‌ থ্যাপ্‌ থ্যাপ্‌ ঝুপ্‌ঝাপ্‌। —সকালবেলায় খেতে বসেছি, এমন সময় এইরকম একটা শব্দ শোনা গেল। একটুখানি উঁকি মেরে দেখি আমাদের তাঁবুর কাছে প্রায় উটপাখির মতন বড় একটা অদ্ভুত রকম পাখি অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে কোন্‌ দিকে চলবে তার কিছুই যে ঠিক-ঠিকানা নাই। ডান পা এদিকে যায় তো, বাঁ পা ওদিকে; সামনে চলবে তো পিছনবাগে চায়, দশ পা না যেতেই পায়ে পায়ে জড়িয়ে হোঁচট্‌ খেয়ে পড়ে। তার বোধহয় ইচ্ছা ছিল তাঁবুটা ভালো করে দেখে, কিন্তু হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়ে সে এমন ভড়কে গেল যে তক্ষুনি হুমড়ি খেয়ে হুড়্‌মুড়্‌ করে পড়ে গেল। তারপর এক ঠ্যাঙে লাফাতে লাফাতে প্রায় হাত দশেক গিয়ে আবার হেলেদুলে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখতে লাগল। চন্দ্রখাই বলল, "ঠিক হয়েছে, এইটাকে ধরে, আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাক।" তখন সকলের উৎসাহ দেখে কে। আমি ছক্কড় সিংকে বললাম, "তুমি বন্দুকের আওয়াজ কর, তাহলে পাখিটা নিশ্চয়ই চমকে পড়ে যাবে আর সেই সুযোগে আমরা চার পাঁচজন তাকে চেপে ধরব।" ছক্কড় সিং বন্দুক নিয়ে আওয়াজ করতেই পাখিটা ঠ্যাং মুড়ে মাটির উপর বসে পড়ল, আর আমাদের দিকে তাকিয়ে ক্যাট্‌ ক্যাট্‌ শব্দ করে ভয়ানক জোরে ডানা ঝাপ্টাতে লাগল। তাই দেখে আমাদের আর এগুতে সাহস হল না কিন্তু লক্কড় সিং হাজার হোক তেজী লোক, সে দৌড়ে গিয়ে পাখিটার বুকে ধাঁই করে এক ছাতার বাড়ি বসিয়ে দিল। ছাতার বাড়ি খেয়ে পাখিটা তৎক্ষণাৎ দুই পা ফাঁক করে উঠে দাঁড়াল। তারপর লক্কড় সিংয়ের দাড়িতে কামড়ে ধরে তার ঘাড়ের উপর দু'পা দিয়ে ঝুলে পড়ল। ভাইয়ের বিপদ দেখে ছক্কড় সিং বন্দুকের বাঁট দিয়ে পাখিটার

ল্যাগব্যাগর্নিস্‌

মাথাটা থেঁৎলে দেবার আয়োজন করেছিল। কিন্তু সে আঘাতটা পাখিটার মাথায় লাগল না, লাগল গিয়ে লক্কড় সিংয়ের বুকে। তাতে পাখিটা ভয় পেয়ে লক্কড় সিংকে ছেড়ে দিল বটে, কিন্তু দুই ভাইয়ের এমন মারামারি বেধে উঠল যে আমরা ভাবলাম, দু'টোই এবার মরে বুঝি। দু'জনের তেজ কী তখন! আমি আর দু'জন কুলি ছক্কড় সিংয়ের জামা ধরে টেনে রাখছি, সে আমাদের সুদ্ধ হিঁচড়ে নিয়ে ভাইয়ের নাকে ঘুষি চালাচ্ছে। চন্দ্রখাই রীতিমত ভরিক্কে মানুষ; সে ছক্কড় সিংয়ের কোমর ধরে লট্‌কে আছে, ছক্কড় সিং তাই সুদ্ধ মাটি থেকে তিন হাত লাফিয়ে উঠে বন্‌বন্ করে বন্দুক ঘোরাচ্ছে। হাজার হোক পাঞ্জাবের লোক কিনা। মারামারি থামাতে গিয়ে সেই ফাঁকে পাখিটা য়ে কখন পালাল তা আমরা টেরই পেলাম না। যা হোক, এই ল্যাগ্‌ব্যাগ্ পাখি বা ল্যাগ্‌ব্যাগর্নিসের কতগুলো পালক আর কয়েকটা ফটোগ্রাফ সংগ্রহ হয়েছিল। তাতেই যথেষ্ট প্রমাণ হবে।

১লা সেপ্টেম্বর, কাঁকড়ামতী নদীর ধারে—আমাদের খাবার ইত্যাদি ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে। তরিতরকারি যা ছিল, তা তো আগেই ফুরিয়েছে। টাটকা জিনিসের মধ্যে সঙ্গে কতগুলো হাঁস আর মুরগী আছে, তারা রোজ কয়েকটা করে ডিম দেয়, তাছাড়া খালি বিস্কুট, জ্যাম, টিনের দুধ আর ফল, টিনের মাছ আর মাংস, এইসব কয়েক সপ্তাহের মতো আছে, সুতরাং এই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের ফিরতে হবে। আমরা এইসব জিনিস গুনছি আর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছি, এমন সময় ছক্কড় সিং বলল যে লক্কড় সিং ভোরবেলা কোথায় বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি। আমরা বললাম, "ব্যস্ত কেন, সে আসবে এখন। যাবে আবার কোথায়?" কিন্তু তার পরেও দুই-তিন ঘন্টা গেল অথচ লক্কড় সিংয়ের দেখা পাওয়া গেল না। আমরা তাকে খুঁজতে বেরোবার পরামর্শ করছি এমন সময় হঠাৎ একটা ঝোপের উপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড জানোয়ারের মাথা দেখা গেল। মাথাটা উঠছে নামছে আর মাতালের মতো টলছে।

গোম্‌রাথেরিয়াম

দেখেই আমরা সুড়্‌সুড়্ করে তাঁবুর আড়ালে পালাতে যাচ্ছি, এমন সময় শুনলাম লক্কড় সিং চেঁচিয়ে বলছে, "পালিও না, পালিও না, ও কিছু বলবে না।" তার পরের মুহূর্তেই দেখি লক্কড় সিং বুক ফুলিয়ে সেই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তার পাগড়ির কাপড় দিয়ে সে ঐ অতবড় জানোয়ারটাকে বেঁধে নিয়ে এসেছে। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে লক্কড় সিং বলল যে সে সকালবেলা কুঁজো নিয়ে নদী থেকে জল আনতে গিয়েছিল। ফেরবার সময় এই জন্তুটার সঙ্গে তার দেখা। তাকে দেখেই জন্তুটা মাটিতে শুয়ে 'কোঁ কোঁ' শব্দ করতে লাগল। সে দেখল জন্তুটার পায়ে কাঁটা ফুটেছে আর তাই দিয়ে দর্‌দর্ করে রক্ত পড়ছে। লক্কড় সিং খুব সাহস করে তার পায়ের কাঁটাটি তুলে বেশ করে ধুয়ে নিজের রুমাল দিয়ে বেঁধে দিল। তারপর জানোয়ারটা তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে দেখে তাকে পাগড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে এসেছে। আমরা সবাই বললাম, "তাহলে ওটা ওইরকম বাঁধাই থাক, দেখি ওটাকে সঙ্গে করে দেশে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা।" জন্তুটার নাম রাখা গেল ল্যাংড়াথেরিয়াম।

সকালে তো এই কান্ড হল; বিকেলবেলা আর-এক ফ্যাসাদ উপস্থিত। তখন আমরা সবেমাত্র তাঁবুতে ফিরেছি। হঠাৎ আমাদের তাঁবুর বেশ কাছেই একটা বিকট চিৎকারের শব্দ শোনা গেল। অনেকগুলো চিল

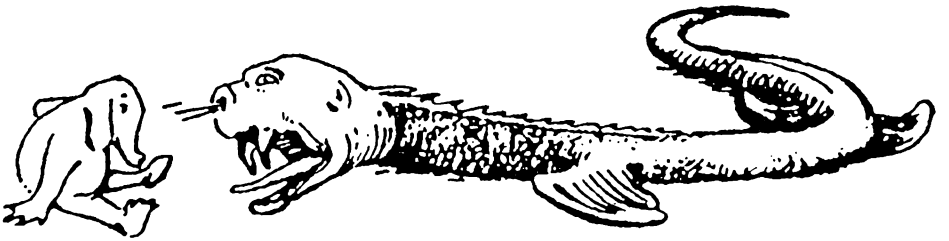

বেচারাথেরিয়াম ও চিল্লানোসোরাস

আর প্যাঁচা একসঙ্গে চেঁচালে যে রকম আওয়াজ হয়, কতকটা সেইরকম। ল্যাংড়াথেরিয়ামটা ঘাসের উপর শুয়ে শুয়ে একটা গাছের লম্বা লম্বা পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছিল; চিৎকার শুনবামাত্র সে, ঠিক শেয়াল যেমন করে ফেউ ডাকে সেইরকম ধরনের একটা বিকট শব্দ করে, বাঁধন-টাধন ছিঁড়ে কতক লাফিয়ে, কতক দৌড়িয়ে, এক মুহূর্তের মধ্যে গভীর জঙ্গলের ভিতর মিলিয়ে গেল। আমরা ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে না পেরে ভয়ে ভয়ে খুব সাবধানে এগিয়ে গিয়ে দেখি, একটা প্রকাণ্ড জন্তু—সেটা কুমিরও নয়, সাপও নয়, মাছও নয়, অথচ তিন-টেরই কিছু কিছু আদল আছে। সে এক হাত মস্ত হাঁ করে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে; আর একটা ছোট নিরীহ-গোছের কী যেন জানোয়ার হাত-পা এলিয়ে ঠিক তার মুখের সামনে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। আমরা মনে করলাম যে এইবার বেচারাকে খাবে বুঝি, কিন্তু পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, কেবল চিৎকারই চলতে লাগল; খাবার কোন চেষ্টাই দেখা গেল না। লক্কড় সিং বলল, "আমি ওটাকে গুলি করি।" আমি বললাম, "কাজ নেই, গুলি যদি ঠিকমতো না লাগে, তাহলে জন্তুটা খেপে গিয়ে কী জানি করে বসবে, তা কে জানে?" এই বলতে বলতেই ধেড়ে জন্তুটা চিৎকার থামিয়ে সাপের মতো এঁকে বেঁকে নদীর দিকে চলে গেল। চন্দ্রখাই বলল, "জন্তুটার নাম দেওয়া যাক চিল্লানোসোরাস।" ছক্কড় সিং বললে, "উ বাচ্চাকো নাম দেও বেচারাথেরিয়াম।"

৭ই সেপ্টেম্বর, কাংকড়ামতী নদীর ধারে।—নদীর বাঁক ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা পাহাড়ের একেবারে শেষ কিনারায় এসে পড়েছি। আর কোনোদিকে এগোবার জো নেই। দেওয়ালের মতো খাড়া পাহাড়; সোজা দু'শো-তিনশো হাত নীচে সমতল জমি পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। যেদিকে তাকাই, সেই দিকেই এরকম। নীচের যে সমতল জমি সে একেবারে মরুভূমির মতো; কোথাও গাছপালা, জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নাই। আমরা একেবারে পাহাড়ের কিনারায় ঝুঁকে এইসব দেখছি, এমন সময় আমাদের ঠিক হাত পঞ্চাশেক নীচেই কী যেন একটা ধড়ফড় করে উঠল। দেখলাম, বেশ একটা মাঝারি গোছের তিমি মাছের মতো মস্ত কী একটা জন্তু পাহাড়ের গায়ে আঁকড়ে ধরে বাদুড়ের মতো মাথা নীচু করে ঘুমাচ্ছে। তখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে এইরকম আরো পাঁচ-সাতটা জন্তু দেখতে পেলাম। কোনটা ঘাড় গুঁজে ঘুমোচ্ছে, কোনটা লম্বা গলা ঝুলিয়ে দোল খাচ্ছে, আর অনেক দূরে একটা পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে ঠোঁট ঢুকিয়ে কী যেন খুঁটে খুঁটে বের করে খাচ্ছে। এইরকম দেখছি, এমন সময় হঠাৎ কট্‌কটাং-কট শব্দ করে প্রথম জন্তুটা হুড়ুৎ করে ডানা মেলে একেবারে সোজা আমাদের দিকে উড়ে আসতে লাগল। ভয়ে আমাদের হাত-পাগুলো গুটিয়ে আসতে লাগল। এমন বিপদের সময় যে পালানো দরকার, তা পর্যন্ত আমরা ভুলে গেলাম। জন্তুটা মুহূর্তের মধ্যে একেবারে আমাদের মাথার উপরে এসে পড়ল। তারপর যে কী হল আমার ভালো করে মনে নাই — খালি একটু একটু মনে পড়ে, একটা অসম্ভব বিট্‌কেল গন্ধের সঙ্গে ঝড়ের মতো ডানা ঝাপটান আর জন্তুটার ভয়ানক কটাকটাং আওয়াজ। একটুখানি

ডানার ঝাপটা আমার গায়ে লেগেছিল, তাতেই আমার দম বেরিয়ে প্রাণ বের হবার যোগাড় করেছিল। অন্য সকলের অবস্থাও সেইরকম অথবা তার চাইতেও খারাপ। যখন আমার হুঁশ হল তখন দেখি সকলেরই গা বেয়ে রক্ত পড়ছে। ছক্কড় সিংয়ের একটা চোখ ফুলে প্রায় বন্ধ হবার যোগাড় হয়েছে; লক্কড় সিংয়ের বাঁ হাতটা এমন মচ্‌কে গিয়েছে যে সে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে; আমারও সমস্ত বুকে-পিঠে বেদনা ধরে গিয়েছে; কেবল চন্দ্রখাই এক হাতে রুমাল দিয়ে কপালের আর ঘাড়ের রক্ত মুছছে, আর এক হাতে এক মুঠো বিস্কুট নিয়ে খুব মন দিয়ে খাচ্ছে। আমরা তখনই আর বেশি আলোচনা না করে জিনিসপত্র গুটিয়ে বন্দাকুশ পাহাড়ের দিকে ফিরে চললাম।

প্রফেসর হুঁশিয়ারের ডায়েরী এইখানেই শেষ। কিন্তু আমরা আরও খবর জানবার জন্য তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম।

তার উত্তরে তিনি তাঁর ভাগ্নেকে পাঠিয়ে দিয়ে লিখলেন, 'এর কাছেই সব খবর পাবে।' চন্দ্রখাইয়ের সঙ্গে আমাদের যে কথাবার্তা হয় খুব সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই ঃ

আমরা। আপনারা যে সমস্ত নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন সে- সব কোথায় গেলে দেখতে পাওয়া যায়?

চন্দ্র। সে-সব হারিয়ে গেছে।

আমরা। বলেন কি! হারিয়ে গেল? এমন এমন জিনিস সব হারিয়ে ফেললেন?

চন্দ্র। হ্যাঁ, প্রাণটুকু যে হারায়নি তাই যথেষ্ট। সে দেশের ঝড় ত আপনারা দেখেননি। তার এক-এক ঝাপটায় আমাদের যন্ত্রপাতি, বড় বড় তাঁবু আর নমুনার বাক্স, সব কাগজের মতো হুশ্‌ করে উড়িয়ে নেয়। আমাকেই ত পাঁচ-সাতবার উড়িয়ে নিয়েছিল। একবার ত ভাবলাম মরেই গেছি। কুকুরটাকে যে কোথায় উড়িয়ে নিল সে ত আর খুঁজেই পেলাম না। সে যা বিপদ! কাঁটা-কম্পাস, প্ল্যান ম্যাপ, খাতাপত্র— কিছুই আর বাকী রাখেনি। কী করে যে ফিরলাম

ল্যাংড়াথেরিয়াম

তা শুনলে আপনার ওই চুলদাড়ি সব সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠবে। আধপেটা খেয়ে, কোনদিন না খেয়ে, আন্দাজে পথ চলে, দুই সপ্তাহের রাস্তা পার হতে আমাদের পুরো তিনমাস লেগেছিল।

আমরা। তাহলে আপনার প্রমাণ-টমাণ যা-কিছু ছিল সব নষ্ট হয়েছে?

চন্দ্র। এই তো আমি রয়েছি, মামা রয়েছেন, আবার কী প্রমাণ চাই? আর এই আপনাদের 'সন্দেশে'র জন্য কতকগুলো ছবি এঁকে এনেছি; এতেও অনেকটা প্রমাণ হবে।

আমাদের ছাপাখানার একটা ছোকরা ঠাট্টা করে বলল, "আপনি কোন্ থেরিয়াম?" আর-একজন বলল, "উনি হচ্ছেন গপ্প-থেরিয়াম—বসে বসে গপ্প মারছেন।" শুনে চন্দ্রখাই ভীষণ রেগে আমাদের টেবিল থেকে একমুঠো চীনেবাদাম আর গোটা আষ্টেক পান উঠিয়ে নিয়ে গজ্‌গজ্ করতে করতে বেরিয়ে গেল। ব্যাপার ত এই। এখন তোমরা কেউ যদি আরো জানতে চাও, তাহলে আমাদের ঠিকানায় প্রফেসার হুঁশিয়ারকে চিঠি লিখলে আমরা তার জবাব আনিয়ে দেব।

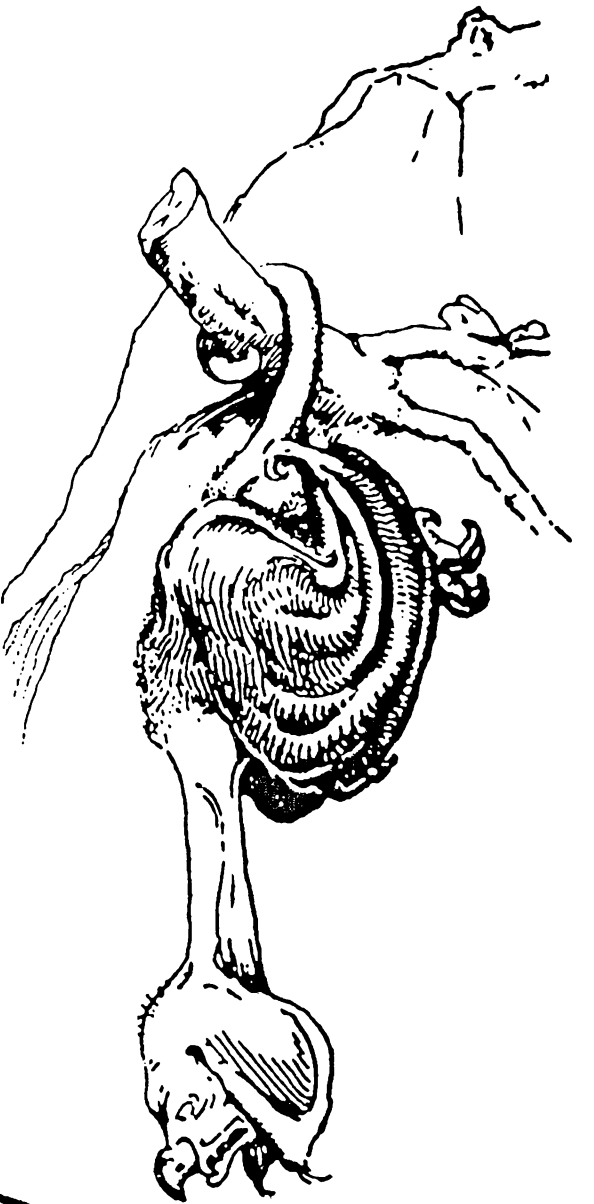

ছড়া

সুকুমার রায়

নন্দ ঘোষের শাম্‌লা গরু
ভাগল কোথায় লক্ষ্মীছাড়া?
নন্দ ছোটে বনবাদাড়ে,
সন্ধানে যায় বদ্যিপাড়া;
শেষকালেতে অর্ধরাতে
হন্দ হয়ে ফিরলে পরে—
বাসায় দেখে, ঘুমোয় গরু
ল্যাজ গুটিয়ে গোয়ালঘরে।

আবোল তাবোল এবং সুকুমার কুইজ

সুগত রায়

'আবোল তাবোল'-এর প্রথম প্রকাশের পঁচাত্তর বছর উপলক্ষ্যে এই কুইজের প্রথম আটটি প্রশ্ন সম্পূর্ণ 'আবোল তাবোল'-কেন্দ্রিক, বাকিগুলি সুকুমার সম্পর্কিত।

১) 'আবোল তাবোল' যখন প্রকাশিত হয় তখন কি সুকুমার রায় জীবিত ছিলেন?

২) 'আবোল তাবোল'-এর একটি কবিতায় সুর দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কোন কবিতায়?

৩) 'গন্ধবিচার', 'দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম'-সহ তিনটি 'আবোল তাবোল'-এর কবিতায় সুর দিয়েছেন এক বিখ্যাত সুরকার। কে?

৪) 'গন্ধবিচার' কবিতাটিকে নিয়ে Animation film তৈরি করেছেন এক প্রবাসী বাঙালি। তিনি কে?

৫) সত্যজিৎ রায়ের দু'টি বইয়ের নাম 'আবোল তাবোল' থেকে নেওয়া। কোন দু'টি?

৬) বাঙলা সাহিত্যের কোন বিখ্যাত চরিত্র মাঝে মাঝে 'আবোল তাবোল' আওড়াত?

৭) এক আধুনিক গীতিকার ও সুরকারের একটি লাইন হঠাৎ পড়তে বসা 'আবোল তাবোল'এর। কার, কোন ক্যাসেটে?

৮) Lewis Jubilee স্যানিটেরিয়ামে (দার্জিলিং) 'আবোল তাবোল'এর কোন বিখ্যাত কবিতা রচিত?

৯) সুকুমারের ডাক নাম 'তাতা', এটি রবীন্দ্রনাথের কোন উপন্যাসের চরিত্র?

১০) মাত্র ন'বছর বয়সে সুকুমারের প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। লেখাটি কী এবং কোন পত্রিকায় বেরোয়?

১১) সুকুমার রায় কোন স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন?

১২) পাগলা দাশু কেন সর্বদা ফুলপ্যান্ট পরত?

১৩) সুকুমার রায় দ্বিতীয় ভারতীয় যিনি ইংল্যান্ডে একটি বিশেষ সম্মান অর্জন করেছিলেন। সম্মানটি কী?

১৪) সুকুমারের প্রতিষ্ঠিত মণ্ডা ক্লাবের 'জাতীয় সঙ্গীত'টি রচনা করেন এক বিখ্যাত বাঙালী। কে?

১৫) সুকুমারের জীবিতকালে তাঁর রচিত একটি মাত্র প্রচার পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। সেটি কি?

১৬) সুকুমার রবীন্দ্রনাথের একটি কৌতুকনাট্যে বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করে খুব নাম করেছিলেন। কোন নাটকের কোন চরিত্র?

১৭) রাবণ লক্ষ্মণকে শক্তিশেল মারার পর কী করেছিলেন?

১৮) সুকুমার সৃষ্ট দু'টি বিখ্যাত কাকের নাম কী?

১৯) ল্যাগব্যাগার্নিস, গোমড়াথেরিয়াম, চিল্লানোসোরাস চরিত্রগুলি সুকুমারের কোন অনবদ্য সৃষ্টির?

২০) 'হ য ব র ল'এ আসামীর শাস্তি কী হয়েছিল?

২১) 'দ্রিঘাংচু', 'শব্দকল্পদ্রুম' ও সত্যজিৎ-এর 'পরশ পাথর'এর মধ্যে মিল কোথায়?

২২) 'চলচ্চিত্র চঞ্চরি'তে ভবদুলালের ভূমিকায় অভিনয় করে নজর কেড়েছিলেন ইনি। পরে সত্যজিৎ-এর ছবির বিশিষ্ট অভিনেতা হন। কে তিনি?

২৩) মণ্ডা ক্লাবের মুখপত্র হিসেবে একটি সরস পত্রিকা বেরোত। পত্রিকাটির নাম কী?

২৪) 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই'-এই প্রবন্ধটি বিশের দশকের প্রথমদিকে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সুকুমারের সাহচর্য ও অনুপ্রেরণায় কোন বিখ্যাত বাঙালী এটি লেখেন?

২৫) সুকুমার কোন রোগে মারা যান?

সত্যজিৎ রায়

বাদুড় বিভীষিকা

ছবি

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

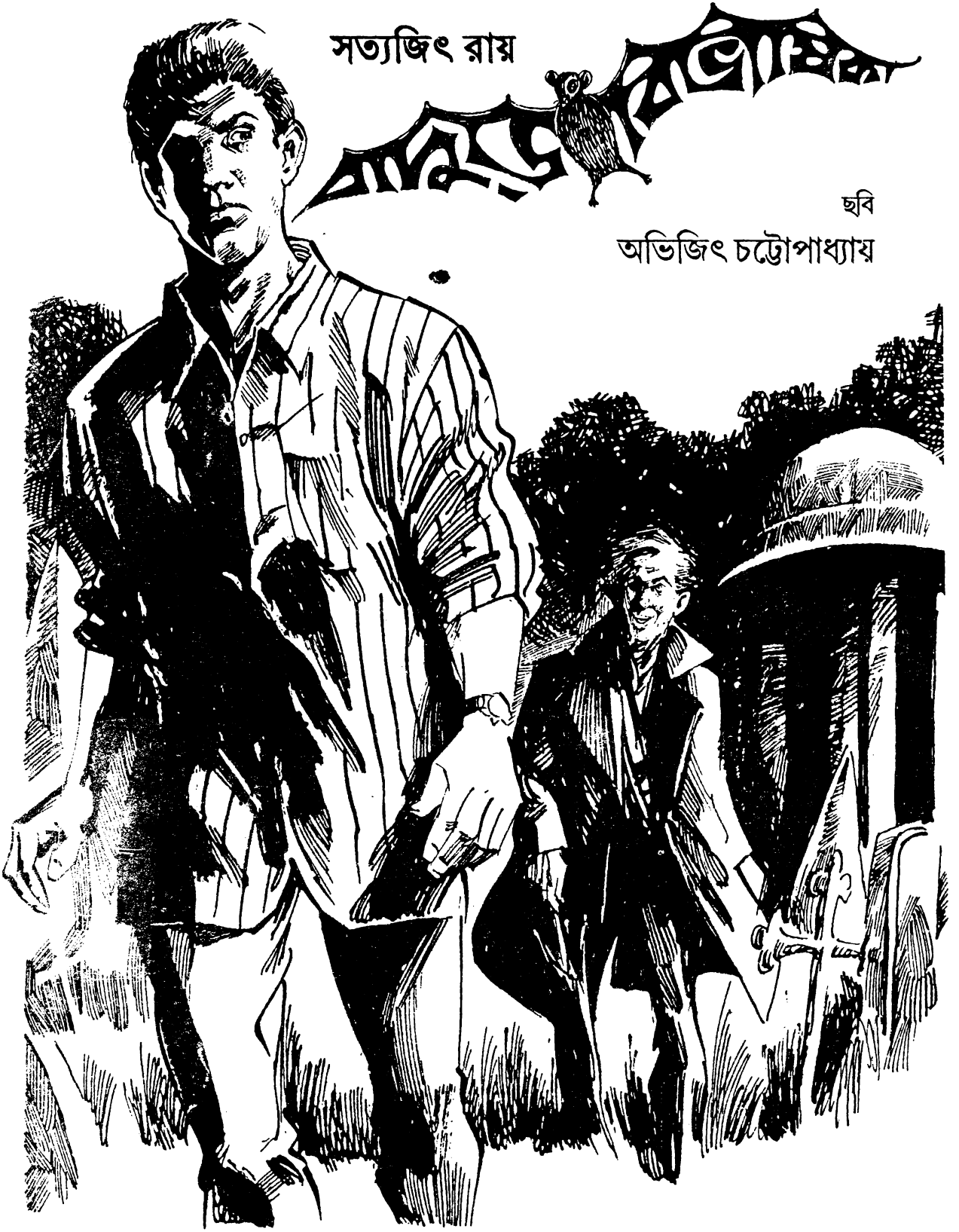

তোমার সঙ্গে যত কম দেখা হয় ততই ভালো!
বাদুড়ের উৎপাত যেমন অসহ্য, বাদুড় সম্পর্কে আলোচনাও তেমনিই অস্বস্তিকর।
আশ্বিন মাসের রাত - তাও যেন কেমন গুমোট করে রয়েছে।
জানালা খুলতেই হচ্ছে!..
কিন্তু সেটা খোলার পরেই -
!
গরাদে মুখ লাগিয়ে সন্ধেবেলার সেই লোক, আমার দিকে চেয়ে -
- হাসছেন! চোখ দুটো জ্বলজ্বলে সবুজ. দাঁতগুলো সরু সরু আর ধারালো। তারপর হঠাৎ -
কি বিদ্ঘুটে স্বপ্ন!
কী হল? শরীর খারাপ, না রাত্রে ঘুম হয়নি?
সকাল সকাল কাজে বেরিয়ে পড়তে হবে। মধুসূদন চা রেখে যাবার সময় লক্ষ্য করলুম সে কিছুটা বিষন্ন -
না বাবু, আমার কিছুই হয়নি।

হয়েছে আমার বাদুরটার।
কী হল আবার?
আজ্ঞে, তা আর মরবে না? এই নিয়ে সাতদিনের বাদুর! গলার কাছটায়-
-মেরেছে ছোবল, কী জানি গোখরো না কী!
মনটা খচ করে উঠল। জন্তুজানোয়ারের গলা থেকে রক্ত শুষে নেয় ভ্যাম্পায়ার ব্যাট...
কাল রাত্তিরে সাপের কামড়ে মরেছে।
সে কী! মরেই গেল?
কিন্তু তার পরেই মনে হল - সাপের ছোবলে বাদুর মরবে এতে আর আশ্চর্য কী? আমি মিছিমিছি দুটো জিনিসের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছি।
মধুসূদনকে সান্ত্বনা দিয়ে কাজের তোড়জোড় করব বলে ঘরে ঢুকতেই দৃষ্টিটা আপনা থেকেই কড়িকাঠের দিকে চলে গেল...
নাঃ - আজ রাত্রে যত গুমোটই হোক না কেন, দরজা জানালা সব বন্ধ করেই রেখে দেব।

সারা দিন অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর পোড়া ইঁটের মন্দির দেখে বেশ আনন্দেই কাটল ...
হেতমপুর থেকে বাসে করে সিউড়ি এসে যখন পৌঁছলুম তখন সাড়ে চারটে ...
গোরস্থানের পাশ দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ কালকের সেই লোকটিকে দেখেই -
?
রাত্তিরে ঘুম হয়েছিল ভালো ?
হ্যাঁ।
আমার আবার কী বাতিক জানেন? রাত্রে আমি একদম ঘুমোতে পারি না। দিনের বেলাটা কষে ঘুমিয়ে নিই ...
... আর সন্ধে থেকে সারা রাতটা এদিক ওদিক বেড়িয়ে বেড়াই। এই গোরস্থানের ভেতর এবং আশপাশে যে কত দেখবার ও শোনবার জিনিস আছে তা আপনি জানেন?

এই যে এরা সব মাটির তলায় কাঠের বাক্সের মধ্যে বন্দী, তারা কি কেউ সেইভাবে থাকতে চায়? চায় না। সকলেই ভাবে — একবারটি যদি বেরিয়ে আসতে পারি! কিন্তু এই বেরোনোর রহস্যটি সকলের জানা নেই। মাঝরাত্তিরে যখন চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে যায় —
— তখন যাদের শ্রবণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ — এই যেমন আমার — তারা এই সব মাটির নীচে কাঠের বাক্সে বন্দী প্রাণীদের ফোকো-ফ্বাস শুনতে পায়। অবিশ্যি কান খুব ভালো হওয়া চাই।
আমার চোখ কান দুটোই খুব ভালো। ঠিক বাদুড়ের মতো…
এগিয়ে এসে আলাপ আমি করি না, কিন্তু আপনি আলাদা। আসাকরি আপনার সঙ্গ থেকে আমি বঞ্চিত হব না!
আর রাগ সামলাতে পারলুম না। হাঁটা থামিয়ে —
দেখুন মশাই, সাত দিনের জন্য এসেছি। বিস্তর কাজ। আপনাকে সঙ্গ দেওয়ার সুযোগ আমার হবে না।
আপনি না দিলেও, আমি ত দিতে পারি! আর আপনি যে সময়টা কাজ করেন — অর্থাৎ দিনের বেলা — আমি সে সময়টার কথা বলছিলাম না।
নমস্কার।
চলবে!

পঁচাত্তরের পূর্তি, আজগুবিয়াস ফুর্তি

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

পরশু রাতে গড়ের মাঠে হঠাৎ শুনি আহা
প্রাণ খুলে খুব হাসছে কারা হো-হো, হি-হি, হা-হা!
গিয়েই অবাক, দেখি একদল 'রামগরুড়ের ছানা'
নিয়ম ভুলেই হাসছে বেদম, করছে না কেউ মানা!!
চটাস্-চটাস্ কুমড়ো পটাশ দিচ্ছে জোরেই তালি
'হুঁকোমুখো হ্যাংলা' লাফায় মেখেই মুখে কালি!
শামলা-মাথায় গামলা বাজায় 'চণ্ডীদাসের খুড়ো'
ডিগবাজি খায় 'কাঠবুড়ো' আর 'কাতুকুতু বুড়ো'!!
'বদ্যিমশাই', 'নন্দ গোঁসাই' কাহিল নেচে গেয়ে
'জগমোহন', 'পাগলা জগাই' হাঁফায় ঘেমে-নেয়ে!
শুধোই এতো কিসের খুশি ভুলেই বিষাদ—শঙ্কা?
বললে সবাই হচ্ছে প্রকাশ 'আবোল-তাবোল' সংখ্যা!!

কালকে দেখি, লোক-গিজগিজ হাওড়া-ব্রিজের চুড়ো
বোম্বাগড়ের মন্ত্রী-রাজা, রাজার পিসি-খুড়ো!
রানীর দাদা-বৌদি, রাজার শ্যালক চন্দ্রকেতু
চাঁদনি-রাতে সবাই হেথায় হাজির কিসের হেতু?
'হাই' তুলছেন হেড-অফিসের শান্ত বড়বাবু
ভীষ্মলোচন, ষষ্ঠীরচরণ চিন্তাতে সব কাবু!!
বলেই ফেলি, সবাই বুঝি ভুলেই বাড়ি যাওয়া
মনের সুখেই খাচ্ছেন বেশ গঙ্গার 'ফ্রেশ' হাওয়া?
বললে ওরা, চলছে দারুণ গোপন পরামর্শ
করবো পালন 'আবোল-তাবোল হীরকদ্যুতি-বর্ষ'!!
যেই ফিরেছি, মুচকি হেসেই বললে চন্দ্রকেতু
পাবেন মজা গেলেই সোজা 'দ্বিতীয় হুগলী সেতু'!
হচ্ছে সেথায় রঙ্গ-রগড়-ঠাট্টা-মজা-ফুর্তি
আজগুবিয়াস সেলিব্রেশন পাঁচাত্তরের পূর্তি!!

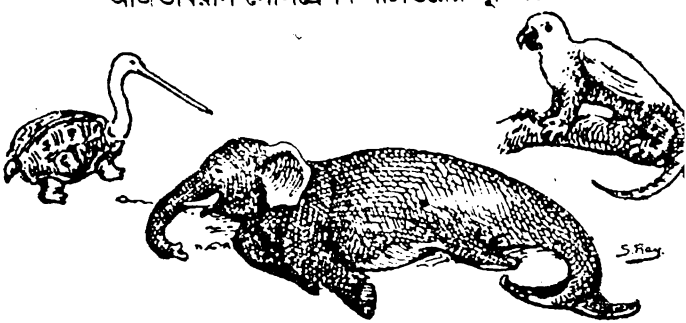

গিয়েই দেখি, সত্যি সেথায় আজব ব্যাপারস্যাপার
চলছে 'সভা' অদ্ভুতুড়ে যেন পাগল-ক্ষ্যাপার!
বিদঘুটে সেই জানোয়ার, ওই কিমাকার 'কিম্ভূত'
তিনিই সভার সভাপতি, জাঁদরেল যমদূত!!
প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি হাঁসজারু-ট্যাশগরু
ভাষণ দিতেই বোঝা গেল গলা নয় কারো মিহি-সরু!
বক্তৃতা শুনে চোখে এলো জল, কান হলো ঝালাপালা
খেয়ে কাঁচাছোলা গলা চাঁচাছোলা, মন বলেঃ পালা-পালা!!
তারপরে শুরু হলো নানা খেলা অভিনব অবিকল
দেখালো হাতিমি, জিরাফড়িং আর সিংহরিণের দল!
বকচ্ছপ ও গিরগিটিয়া, মোরগরু-বিছাগল
দেখি 'আহ্লাদে আটখানা' সব, আনন্দে উচ্ছল!
যেই বলিঃ এই, কিসের এতোই বাজছে বিজয়-ডঙ্কা?
বলে, 'সন্দেশ' করছে প্রকাশ 'আবোল-তাবোল' সংখ্যা!!

'আবোল তাবোল' এর একটি কবিতার পাণ্ডুলিপি।

আবোল তাবোল

তখন আর এখন

সিদ্ধার্থ ঘোষ

আবোল তাবোল অনেক কারণেই অভিনব। বাঙালি হয়ে জন্মানোর দু'চারটে সুবিধার মধ্যে একটা, নিজের ভাষায় আবোল তাবোল উপভোগ করার সুযোগ। ছোট থেকে বড়—যে কোন বয়সের এমন আবোল তাবোল সঙ্গী পাওয়া ভার। সাহিত্য হিসাবে, সামাজিক সমালোচনা হিসাবে, বাংলা ভাষার নন্‌সেন্স দুনিয়ার উদ্বোধক হিসাবে অনেক আলোচনা হয়েছে এই বইটি নিয়ে। আরও হবে। দুনিয়াটা যত কেজো হয়ে উঠবে আবোল তাবোল ততই পুষ্টি লাভ করবে। কিন্তু আবোল তাবোল-এর একেবারে ভিন্ন একটি দিক নিয়ে এই আলোচনা। বাংলা বইয়ের দুনিয়ায় ছবি ও ছাপার বিচারেও আবোল তাবোল অভিনব।

সত্যজিৎ রায়ের হাতে 'সন্দেশ' যখন আবার নতুন রূপে বেরোতে শুরু হল তখন আমরা স্কুলে পড়ি। সেই সময়ে (১৯৬১ সাল, যেটা রবীন্দ্রনাথেরও জন্ম শতবর্ষ) আমরা সিগনেট প্রেস থেকে ছাপা একটা আবোল তাবোল-এর পাতা উল্টোতাম। কয়েক যুগ পরে, ১৯৮৩-তে হঠাৎ-ই একটা অন্য চেহারার আবোল তাবোল-এর দেখা পেলাম। প্রকাশকের বক্তব্য অনুসারে, এইটাই নাকি আবোল তাবোল-এর আদি চেহারা। আবোল তাবোল-এর প্রকাশের ষাট বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে তাঁরা সুকুমার রায় পরিকল্পিত প্রথম সংস্করণটি নতুন করে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে চাইছেন। 'দেশ' পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন এই প্রকাশক। তাতে উদ্ধৃত হয়েছিল সত্যজিৎ রায়ের একটি চিঠির অংশ। প্রকাশককে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি লিখেছিলেন যে, আবোল তাবোল-কে যে আবার তার স্বরূপে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে, তার জন্য তিনি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছেন।

মজার কথা, সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত আবোল তাবোল সংস্করণটির পরিকল্পনা অর্থাৎ ডিজাইন কিন্তু স্বয়ং সত্যজিৎ করেছিলেন। কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই, মামলায় জড়িয়ে পড়লে এবং হ-য-ব-র-ল-এর প্যাঁচা-বিচারক তলব করলে নিশ্চয় প্রচুর ভুগতে হবে, তবু না-লিখে পারছি না কয়েকটি কথা। সুকুমার রায়ের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে এবং আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত সুকুমার রায় রচনাবলীর তৃতীয় খন্ড প্রকাশের সূত্রে নানা প্রয়োজনে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কিছু কাজ করার সুযোগ হয়। এক দিন আবোল তাবোল-এর আদি সংস্করণের সঙ্গে তার সিগনেট সংস্করণের তফাৎ নিয়ে কথা ওঠে। সত্যজিৎ বলেছিলেন, সিগনেট সংস্করণে আবোল তাবোল নবরূপে ছেপে বেরোবার পর তাঁর মা, সুপ্রভা দেবী ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন ও বেশ কিছুদিন সত্যজিতের সঙ্গে কথা বলেননি। কেন ও কোন পরিস্থিতিতে সত্যজিৎ তাঁর বাবার হাতে গড়া আবোল তাবোল-এর চেহারা বদল করেন, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। জানা দরকার, চেহারাটা কতটা ও কি ভাবে বদলে গিয়েছিল।

আবোলে তাবোল প্রথম যখন ছাপা হয় সেটার চেহারা ছিল বাংলা পুঁথির মতো। এমনিতে ছাপা বইয়ের বাঁধাই থাকে বাঁ দিকে আর তার পাতা উল্টোতে হয় বাঁ-দিক ডান-দিক করে। কিন্তু প্রথম সংস্করণে বইটির বাঁধাইটা ছিল রাইটিং প্যাডের মতো—মাথার দিকে। কারিগরি ভাষায় যেটাকে আমরা প্রচলিত 'ভার্টিকাল' আকার না বলে, 'হরাইজন্টাল' আকার বলতে পারি।

আবোল তাবোল প্রথম ছাপা হয়েছিল ১০০, গড়পার রোডের ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স থেকে। ইউ. রায় মানে উপেন্দ্রকিশোর রায়, সুকুমারের বাবা। আর গড়পার রোডে নিজেদের বাড়িতে বাস করতেন উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার। ওই বাড়িতেই সত্যজিতেরও জন্ম। গড়পার রোডে শুধু রায় পরিবারের আস্তানা নয়, এই বাড়িতে নীচের তলায় ছিল একটি ছাপাখানা, আর দোতলায় ছবির-ব্লক তৈরির কারখানা

—নাম, ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স। এই ছাপাখানা থেকেই সন্দেশ প্রত্রিকার প্রকাশ শুরু হয় ১৯১৩ থেকে।

ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স থেকে প্রকাশিত এবং সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত আবোল তাবোল-এর মধ্যে তুলনায় শুধু যুগের ব্যবধান ছিল না, ছিল আরও অনেক অমিল। আকারে, সজ্জায় ও বর্জনে।

প্রথমেই চোখে পড়বে যে মূল বইটির প্রচ্ছদটি ছিল তিনটি তিন রঙা চিত্রের সমাহার। তার মধ্যে শুধু একটি (মধ্যবর্তী ছবিটি) ব্যবহার করা হয়েছিল সিগনেট সংস্করণে। তার কারণটাও খুব স্পষ্ট। বইয়ের বাঁধাইয়ের অর্থাৎ ফর্মাটিঙের বদলের ফলেই আদি মলাটের ছবিগুলির অংশবিশেষ বাদ দিতে হয়েছিল। এই ফরমাট পরিবর্তনের জন্যই সিগনেট সংস্করণে বাদ পড়েছিল আরও একটি ছবি। যেটি সুকুমার তাঁর বইয়ের মুখপাত্র বা 'ফ্রন্টিস্‌পিস্‌' রূপে এঁকেছিলেন। ভীষ্মলোচনের গান গাওয়ার রঙীন দৃশ্য। (সন্দেশে ছাপার সময়ে এই ছবিটিরই একটি রঙবিহীন রেখাচিত্র ছাপা হয়েছিল।) এই ছবিটিতে ভীষ্মলোচনের বেশবাস তাকে এমন একটি মাত্রা দেয় যা কবিতাটিকে নতুন ভাবে পড়তে শেখার ইংগিতবাহী।

সুকুমার তাঁর স্বল্প জীবনের শেষ ক'বছর প্রায়ই শয্যাশায়ী থাকতেন দুরারোগ্য কালাজ্বরের শিকার হয়ে। এই অসুস্থতার পর্বেই তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন 'আবোল তাবোল' ও 'হ-য-ব-র-ল' গ্রন্থদুটি প্রকাশের জন্য। ১৯২৩-এর ১০-ই সেপ্টেম্বর, যেদিন কলকাতা ভূমিকম্পে কেঁপেছিল, সুকুমার চলে যান। তার ন'দিন পরে ১৯-শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয় 'আবোল তাবোল'। 'অতীতের কথা' নামে একটি পুস্তিকার কথা বাদ দিলে, সুকুমার তাঁর কোন বইয়েরই প্রকাশ দেখে যাননি।

এই প্রসঙ্গে, 'হ-য-ব-র-ল' সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার। 'আবোলে তাবোল'-এর মতো এই বইটিরও মুদ্রণ-পরিকল্পনা করেছিলেন সুকুমার। 'হ-য-ব-র-ল' পরবর্তীকালে যখন সিগনেট সংস্করণে প্রকাশিত হয়, সেটি শুধু আকারে

সুকুমার রায়চৌধুরী, বি-এস্-সি, এফ্-আর-পি-এস্ প্রণীত

আবোল তাবোল

বাহির হইয়াছে।
পাতায় পাতায় হাসি, পাতায় পাতায় মজার ছবি!
সুন্দর মোটা কাগজে ছাপা, চমৎকার রঙ্গিন মলাট,
মজবুত বাঁধাই।
উপহারের এমন বই আর নাই।

দাম ৸৹ আনা।

সন্দেশ কার্য্যালয়, ৭২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বলিয়ান কিন্তু তার ফরম্যাট পাল্টানো হয়নি। কিন্তু এখানেও বর্জিত হয়েছিল একটি রঙীন ছবি। সুকুমার যেটি 'হ-য-ব-র-ল' বইটির মুখপত্র হিসাবে রচনা করেছিলেন। সেই বিখ্যাত ও এখনও বলবৎ বিচারের দৃশ্য। যখন বিচারক ঘুমিয়ে পড়েও চোখের ব্যারামের জন্য 'বেনিফিট অফ ডাউট' লাভ করেন। 'হ-য-ব-র-ল'-এর প্রচ্ছদ পরিকল্পনাটিও তিনি বিদায় নেওয়ার আগেই করে গিয়েছিলেন। আবোল তাবোলের বেশির ভাগ কবিতা ও 'হ-য-ব-র-ল' প্রথম প্রকাশিত হয় সন্দেশে।

রায় পরিবারের ব্যক্তিগত সংগ্রহে বাঁধাই-করা পুরনো সন্দেশ পত্রিকার পাতা উল্টোলেই জানা যায় আবোল তাবোলের সন্দেশ পাঠের ওপর কি ভাবে কলম চালিয়ে মাজা-ঘষা করেছিলেন লেখক। লাইনের পর লাইন কেটে বাদ দিয়েছেন, শব্দ পাল্টেছেন, সংযোজনও করেছেন শব্দ বা পুরো বাক্য নতুনভাবে। আগ্রহী পাঠকেরা আবোল তাবোলের কবিতাগুলির সন্দেশ-পাঠ দেখতে পারেন সুকুমার রচনাবলীর তৃতীয় খন্ডে (আনন্দ পাবিলিশার্স)। শুধু যদি পাঠটুকুই সংশোধন করবেন, তা হলে এই রচনার প্রয়োজন পড়ত না। অধিকাংশ লেখকই নিজের রচনার পরিমার্জনা করেন।

সুকুমার আবোল তাবোলের একটি 'ডামি' কপি বানিয়েছিলেন। 'ডামি' বলতে বোঝায় আসন্ন প্রকাশের অপেক্ষায় বইটির পাতার সংখ্যা, আয়তন ও আয়োজনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ও বাঁধাই-করা সাদা পাতার একটি খাতা।

আবোল তাবোলের 'ডামি' কিন্তু অনেক কারণেই স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট। 'ডামি' তৈরি করার জন্য প্রথমেই তিনি তাঁর কবিতাগুলিকে কম্পোজ করিয়ে আনেন নতুন করে। যাতে কোন কবিতাটা কত লাইন, কতটা জায়গা জুড়ে থাকবে বোঝা যায়। তার পরে তিনি স্থির করেন এই পাঠগুলিকে কিভাবে সাজানো যায় বইয়ের পাতায়। বইয়ের কোন পাতায় কোন কবিতার ক-লাইন ছাপা হবে ও কি ভাবে—সেই নির্দেশও দিয়েছেন তিনি ওই 'ডামি'র প্রতিটি পাতায়।

সন্দেশে প্রকাশিত আবোল তাবোলের সাতটি কবিতার সাধারণ শিরোনাম ছিল 'আবোল তাবোল'। কিন্তু ডামি কপিতে এগুলিকে তিনি বিশিষ্ট করেছিলেন বিভিন্ন শিরোনামে। 'গানের গুঁতো', 'কাঠবুড়ো', 'খুড়োর কল', 'দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম', 'গল্প বলা', 'ভুতুড়ে খেলা' ও 'নেড়া বেলতলায় যায় কবার'—এই লেখাগুলি আবোল তাবোল শিরোনামে ছাপা হয়েছিল সন্দেশে। তাছাড়া আরও দশটি কবিতার শিরোনাম বদলের নির্দেশ রয়েছে ডামিতে। যেমন 'জিজ্ঞানু' এখন আমাদের অতি পরিচিত 'নোট বই' আর 'কেন?' হয়েছে

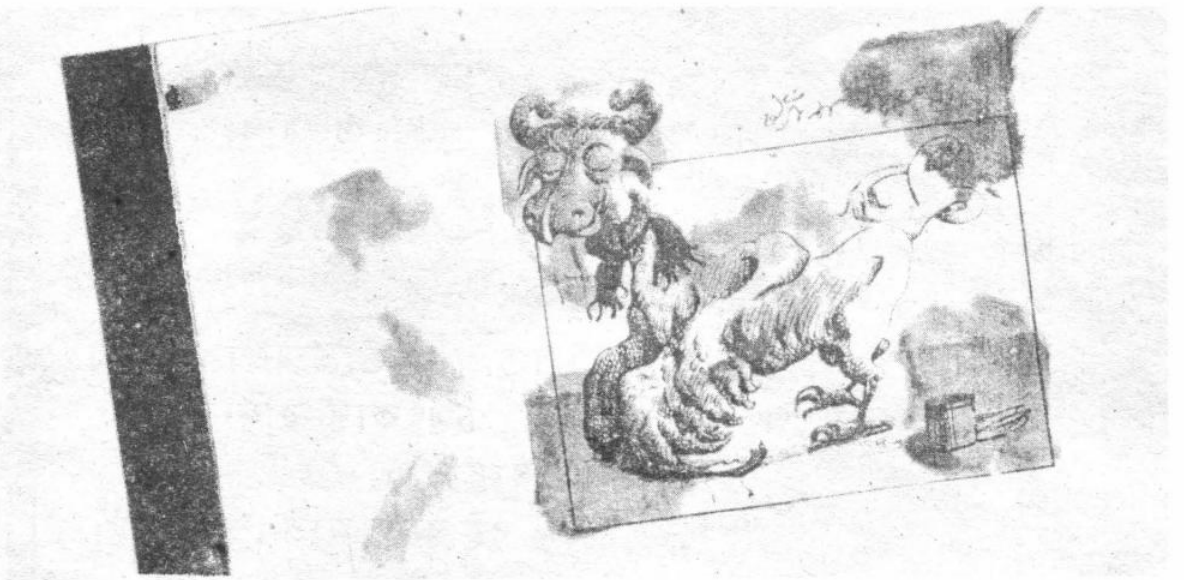

'বোম্বাগড়ের রাজা'। পরিশিষ্টে এই নাম বদলের তালিকা দেওয়া হয়েছে।

ডামি কপিতে 'কিম্ভূত' কবিতার ছবিটির পাশে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন 'ব্লক কাটিয়া টাইপ বসিবে'। তার মানে ব্লকের কিছু অংশ (যেখানে ছবি নেই) বাদ দিয়ে সেই জায়গায় কবিতার শিরোনামটিকে ঠাঁই দিতে হবে। (ব্লক সাধারণত চৌকো বা আয়তাকার চেহারায় তৈরির হয়। বিশেষ নির্দেশ থাকলে তবেই এভাবে ব্লক কাটা হয়)। একই নির্দেশ ছিল 'আহ্লাদ', 'হাতগণনা' ও 'ট্যাঁশগরু'-র পাতাগুলিতে।

এবার ছবির কথা। সন্দেশে প্রকাশের সময়ে সুকুমার বেশ কটি ছবি এঁকেছিলেন যা হাফটোন ব্লক ছাড়া ছাপা সম্ভব নয়। অর্থাৎ, শুধু সাদা পাতার ওপর কালো রেখা দিয়ে আঁকা ছবি নয়, সে-সব ছবির মধ্যে সাদা ও কালোর মধ্যবর্তী আমেজও ছিল। আবোল তাবোলের ডামি কপিতে তিনি কিন্তু যাবতীয় হাফটোন-চিত্র বাদ দিলেন এবং নতুন করে. শুধু কালো রেখায় সেই ছবিগুলি আঁকলেন যাতে হাফটোন নয়, লাইন ব্লক থেকে ছবিগুলি ছাপা যায়। তাছাড়া বইয়ের পাতার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য কিছু ছবির আকারেরও হেরফের করেছিলেন। আবোল তাবোলের জন্য 'ভীষ্মলোচন'কে নতুন করে এঁকেছিলেন। এই সব লাইন ব্লকের থেকে প্রিন্ট নিয়ে তিনি ডামি তৈরি করেছিলেন। আবোল তাবোলের টাইটেল পেজের নামাঙ্কন ও শেষ পাতার 'সমাপ্ত'-র ব্লক-প্রিন্টও সাঁটা আছে ডামিতে। হাফটোনের বদলে কেন লাইন ব্লক ব্যবহার করলেন সুকুমার? মুদ্রণ বিষয়ে পিতা উপেন্দ্রকিশোরের মতোই বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি। লন্ডন ও ম্যাঞ্চেস্টারে উচ্চশিক্ষাও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জানতেন যে সন্দেশ ছাপা হয় হোয়াইট প্রিন্ট নামে পরিচিত এক ধরনের মসৃণ কাগজে, কিন্তু বইটি ছাপা হবে কিছুটা খসখসে 'অ্যান্টিক' কাগজে। এই ধরণের কাগজে হাফটোন ব্লক ভালোভাবে ছাপা যায় না। কালি ধেবড়ে যায়। সেই জন্যেই নতুন করে কিছু ছবি আঁকতে হলো তাঁকে। যাকে টেলপিস্ বলা হয়। পাদপূরক চিত্র। ডামিতে মূল কবিতার লাইন গুনে এবং ছবি সাঁটার পর কিছু কিছু পাতায় দেখা গেল, একটু বেশি জায়গা সাদা পড়ে থাকছে। যেটা চোখে ভাল লাগছে না। সে সব জায়গায় প্রয়োজন বুঝে তিনি টেলপিস আঁকলেন। এই টেলপিস্-গুলি সবই 'সিলুয়েট' রীতিতে আঁকা। বোঝা যায় তিনি সেকালের বিখ্যাত গ্রন্থচিত্রক আর্থার র‍্যাকম্যানের কাজের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ছবিগুলির বিষয় পুরোপুরি ভারতীয়। আবোল তাবোল বনাম ভদ্রলোকী শিক্ষিত মানুষদের টানাটানি, কিম্বা এ-ওর বিরুদ্ধে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছে--কিন্তু স্টাইলের দিক থেকে র‍্যাকম্যানের কাজের সঙ্গে মিল আছে। এই ধরনের টেলপিসগুলির ব্লক-প্রিন্ট তিনি সেঁটেছিলেন 'গানের গুঁতো', 'কুমড়োপটাশ', 'নেড়া

বেলতলায় যায় ক'বার?', 'হুঁকোমুখো হ্যাঁংলা', 'ঠিকানা' ও 'ট্যাঁশগরু' কবিতার শেষে।

ছবি ও পাঠ যখন পুরোপুরি পাতা ভরাতে পারেনি তখন পাদপূরণের জন্য কোথাও আবার টেলপিস্ না-এঁকে, ছোট ছোট চার ছয় লাইনের কবিতাও রচনা করেছিলেন তিনি। তার মধ্যে রয়েছে 'কহ ভাই কহরে', 'শুনেছ কি বলে গেল সীতানাথ বন্দ্যো', 'শোন শোন গল্প শোন', 'আকাশের গায়ে কিবা রামধুনু খেলে', 'ঢপ্ ঢপ্ ঢাক ঢোল', 'মাসিগো মাসী পাচ্ছে হাসি' ও 'বলব কি ভাই হুগলী গেলুম'। ডামি কপিতে নিজের হাতে তিনি কবিতাগুলি লিখেছিলেন।

ডামি কপিতে দুটি কবিতার পাণ্ডুলিপি আছে যা সন্দেশে ছাপা হয়নি—'সৎপাত্র' ও 'ঠিকানা'। আবোল তাবোলের প্রথম ও শেষ কবিতাও সন্দেশে ছাপা হয়নি কিন্তু ডামিতে পাণ্ডুলিপি নেই। দুটি কবিতারই এক নাম—'আবোল তাবোল'। পাণ্ডুলিপি না থাকলেও তাদের ও ছবিগুলির ব্লক প্রিন্ট সাঁটা আছে।

আবোল তাবোলের শেষ কবিতা সুকুমার রায়ের শেষ রচনা। সত্যজিৎ রায় লিখেছিলেন এই কবিতাটির বিচিত্র মিশ্র রস বাংলা সাহিত্যে চিরকালের বিস্ময়ের বস্তু হয়ে থাকবে। এটি রচনার সময় যে তাঁর উপর মৃত্যুর ছায়া পড়েছিল তার ইঙ্গিত এর শেষ, কয়েক ছত্রে আছে—

আদিম কালের চাঁদিম হিম
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর
গানের পালা সাঙ্গ মোর।

'জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়ে এমন রসিকতা আর কোনো রসস্রষ্টার পক্ষে সম্ভব হয়েছে বলে আমার জানা নেই।' এ-কথা সত্যজিৎ লিখেছিলেন ১৯৭৩ সালে সুকুমার রচনাবলীর (আনন্দ) ভূমিকায়। বিস্ময়কর ঘটনা, বাইপাস সার্জারি সেরে কলকাতা ফেরার পর তখনও সত্যজিৎ কোনও ছবি তৈরির কাজ শুরু করতে পারেননি এই সময়ে প্রকাশ হল তাঁর প্রথম কবিতার বই 'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম'—ননসেন্স কবিতার সংকলন। অন্য এক ধরনের আবোল তাবোল। মৃত্যুর ছায়া কি তাঁকেও ঘিরেছিল? এ প্রশ্ন উত্তর সন্ধান করে না।

মৃত্যুর ছায়া কিন্তু শুধু আবোলে তাবোলের শেষ কবিতায় পড়েনি, পড়েছিল বইয়ের শেষ পাতাতেও যেখানে হাতের লেখা সমাপ্ত শব্দটির ব্লক প্রিন্ট সাঁটা আছে। একটা কালো রক্তের ছোপ—ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে—তার মধ্যে সাদা হরফে ফুটে উঠেছে সমাপ্ত। এই কালো রক্তের ছোপ তাঁর হাত

থেকে খসে-পড়া পেনের ডগা থেকে বেরোতে পারে কিম্বা লেখা শেষ করে পেনের অবশিষ্ট কালিটুকু আর কোনো কাজে লাগবে না ভেবে, ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেন ওইভাবে।

'পাগলা দাদু', 'হ-য-ব-র-ল', 'দ্রিঘাংচু' প্রভৃতির স্রষ্টা বইয়ের পাঠ বা শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই-ক্ষ্যাপার মতো একটি চরিত্র। ইস্কুল-শাসন ও ন্যায়-আইন ইত্যাদির বিরুদ্ধে ভাষাকে দাঁড় করাতে হলে যে আবোল তাবোল-ই সেরা সে-বিষয়ে তাঁর দ্বিধা ছিল না। একই কারণে বই ছাপার রীতি-বিধির চলতি একুশে আইন অমান্য করে পুঁথির মতো চেহারা দিয়ে আবোল তাবোলকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন পুঁথি-পাঠেরই সমালোচনা রূপে। আবোল তাবোলের কবিতাগুলির মেজাজের সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ তাঁর এই বইটির পরিকল্পনা। দুর্ভাগ্য আমাদের, সিগনেট প্রেসের আমল থেকে আবোল তাবোলকে আমরা আরও চার-পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চেয়েছি। বইয়ের তাকে, আলমারিতে যাতে আবোল তাবোল তার আকারের স্পর্দ্ধায় বা পাগলামিতে অবৈষয়িক বাড়তি আবদার না জানায়।

পরিশিষ্ট

সন্দেশে প্রকাশিত কবিতার শিরোনাম	আবোল তাবোলে প্রকাশিত তার পরিবর্তিত শিরোনাম
আবোল তাবোল	কাঠবুড়ো
ওই আমাদের পাগলা জগাই	লড়াই ক্ষ্যাপা
আবোল তাবোল	গানের গুঁতো
আবোল তাবোল	খুড়োর কল
আবোল তাবোল	দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম
আবোল তাবোল	গল্প বলা
আবোল তাবোল	ভূতুড়ে খেলা
হেস না	রামগরুড়ের ছানা
ভয় কিসের?	ভয় পেয়ো না
দুঃখের কথা	হাত গণনা
আবোল তাবোল	নেড়া বেলতলায় যায় ক বার?
অবুঝ	বুঝিয়ে বলা
ওই যা!	ফস্‌কে গেল
বিজ্ঞাপন পাঠ	বিজ্ঞান শিক্ষা
জিজ্ঞাসু	নোটবই
বাপরে	বাবুরাম সাপুড়ে
কেন?	বোম্বাগড়ের রাজা

(শিরোনাম-বিহীন কয়েকটি কবিতা 'ছড়া : ছিটেফোঁটা' নামে সন্দেশের বৈশাখ ১৩২৮ ও ১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল)

একদিন অতনু অবলীলাক্রমে ওদের ঘরের দেয়াল ভেদ করে ওপাশে চলে গেল। বাড়িটা তিনতলা। একতলায় মাঝ বরাবর বাড়ির ভেতরে যাবার রাস্তা। একদিকে প্রেস আর ছোট একটা লন্ড্রি। অন্যদিকে ব্যাটারি মেরামতি আর গাড়ি সারাবার দোকান, তার পাশে লেদ মেশিনের কারখানা। অতনুর বাবা, জ্যাঠা আর কাকারা মিলিয়ে চার ভাই। দোতলা, তিনতলায় আধা-আধি ভাগ ইঁটের দেয়াল দিয়ে পাকা করে রাখা। যাতে কেউ কারোর মুখ না দেখে। কবে অতনুর ঠাকুর্দার বাপ জ্যাঠারা এ বাড়ি করেছিল কে জানে! একেবারে জরাজীর্ণ না হলেও এ পাড়ার বেশির ভাগ বাড়ির মতো পুরনো ধূসর চেহারা। অতনু জ্ঞান অব্দি দেখে আসছে এ পাশের লোকেদের ওপাশে যাওয়া বারণ। অথচ সেদিন অতনু অনায়াসে দেয়াল ভেদ করে ওপাশের ঘরে গিয়ে হাজির হল।

ওপাশের ঘর মোটেই এপাশের মত নয়। মেঝেতে বড় বড় চৌকো লাল, নীল পাথর। এককোণে টুলের ওপর গাড়ি সারাবার মিস্তিরির তেল চিটে জামাপ্যান্ট পরে বসে আছে লন্ড্রিওয়ালা। অতনুকে দেখেই বলল, 'সেই তখন থেকে অপেক্ষা করছি, আর একটু হলেই ঘুমিয়ে পড়ছিলাম আর কী।'

'আমি আসব জানলে কী করে?'

'বারে, কেন জানব না। দুটো পাঞ্জাবী, তিনটে শার্ট, একটা হাফপ্যান্ট--সেমি-আর্জেন্ট ধোলাই। আজই ডেলিভারি ডেট। এই নাও তোমার জামাকাপড়।' জামাকাপড়ের অবস্থা দেখে অতনুর চোখে প্রায় জল এসে গেল। সবগুলো তেলকালি-মাখা গাড়ি সারানোর কস্টিউম হয়ে গেছে।

অতনুর মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা আন্দাজ করে লন্ড্রিওয়ালা বলল, 'আমার কাচা যদি পছন্দ না হয়ে থাকে তাহলে ওগুলো মদনকে দিয়ে দিও, ওর তো গাড়ি সারানোর কাজে লাগবেই, ও তোমাকে ধোলাইয়ের পয়সা ফেরত দিয়ে দেবে।'

'কিন্তু এখন মদনকে পাই কোথায়?' মদন হচ্ছে নিচে গাড়ি সারাবার দোকানের মিস্ত্রি, বয়সে অতনুর চেয়ে সামান্য বড়।

আঙ্গুল তুলে লন্ড্রিওয়ালা উল্টোদিকের দরজাটা দেখিয়ে দিল।

দরজা দিয়ে বেরিয়েই অতনু দেখল সুন্দর একটা বাগান, তার মধ্য দিয়ে পায়ে চলা পথ। একটা ছোট ছেলে হাত দিয়ে নাকের সর্দি মুছতে মুছতে চলে গেল। মুখটা কি রকম চেনা-চেনা ঠেকল। হ্যাঁ ঠিক ধরেছি, ছোট কাকার মেজ ছেলে পটা। মনে মনে বলল অতনু। হাতে তাবিজ, গলায় মাদুলি, বছরে ছ'মাস সর্দিকাশিতে ভোগে। এখন একেবারে বাহারে সাজে। হাতে কারুকার্য করা বেঁটে লাঠি, মাথার দিকটা চক্‌চক্ করছে। ওপাশ থেকে রুপোলী তারের চশমা পরা চিমড়ে মতো একটা লোক ছেলেটার মুখোমুখি হতেই মাটিতে উপুড় হয়ে প্রণাম করে কি একটা ছড়া কাটতে লাগল। মানে কিছু বোঝা না গেলেও সেটা যে স্তুতিবাক্য তাতে সন্দেহ নেই। ছড়াটা এই রকম—

'ছাগল গাছে আগল দিয়ে লন্ড্রি চালানো বুজরুকি
লেদ মেশিনে ছাপছে কাগজ, কাপড় ধোলাই টুকটুকি।
গাড়ির আওয়াজ নানান সুরে—ভপ্ ভপ্ ভপ্ পি-পি,
সেলাম রাজা সেলাম তোমায় তেলের বোতল ছিপি।'

এই বলে প্রণাম করে চিমড়ে লোকটা উঠে দাঁড়াল। বালক এক হাতে দন্ড তুলে আরেক হাতে নাকের সর্দি মুছে আধো-আধো চিঁ-চিঁ সুরে কি যেন বলে ড্যাবড্যাবে চোখ করে পেছন ফিরে অতনুকে দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে চিমড়ে লোকটা চশমাটা নাকে ঠিক মতো সেট করে নিয়ে এক ছুট্টে অতনুর কাছে এসে হাঁফাতে লাগল।

ওমা, এ যে নিচের তলার প্রেসের কাম্পোজিটার হরেনবাবু—অতনু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

হরেনবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'সর্বনাশ করেছ! তুমি আমাদের রাজাবাবুকে সেলাম দাওনি!'

'ও যে তোমাদের রাজা সে আমি জানব কি করে!'

'সে কি, সবাই জানে আর তুমি জান না! ওর হাতে রাজদন্ড দেখনি!'

'নাক দিয়ে পোঁটা পড়া একটা ভ্যাবা গঙ্গারাম যে কি করে রাজা হয় জানি না।'

'ও যে আর কোন কাজ পারে না।' চট্ করে উত্তর দিল হরেনবাবু, 'না পারে কম্পোজিটারের কাজ, না পারে গাড়ি সারাতে, না পারে কাপড় ধুতে।'

'তাই বলে সে রাজা হবে?' রাগে গজগজ করতে লাগল অতনু।

'হবে না! ও যে নিজে বলল ও এখানকার রাজা, তাইত' ওকে রাজা করা হল।'

'বারে, আমি যদি বলি, 'আমি এখানকার রাজা' তাহলেই আমি রাজা হয়ে যাব?'

'না তা কেন হবে!'

'ও বললে ও রাজা হবে, আর আমি বললেই বা আমি রাজা হব না কেন?'

'খুব সহজ কথা। একবারটি এদিকে এস, ওই পুকুর পাড়ে জলের ধারে বসে জলের মত করে তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি।' এই বলে হরেনবাবু অতনুকে টানতে টানতে পুকুর পাড়ে একটা বিশাল গাছের নিচে নিয়ে এসে বসাল। তারপর কোন ভূমিকা ছাড়াই বলতে শুরু করল। 'কি যেন বলছিলে? ওঃ হ্যাঁ, ও যদি রাজা হয় তাহলে তুমি হবে না কেন? এই জন্য বলি দিন-রাত ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে না বেড়িয়ে একটু পড়াশুনো কর। তার সবচেয়ে বড় ও একমাত্র কারণ, ও—ও আর তুমি—তুমিই। আশা করি এবারে পরিষ্কার বুঝতে পারছ।'

'হুঁঃ-হুঁঃ-বাবা, যুক্তিতে ওর সঙ্গে পারবে না।' কথাটা শুনে ওপর দিকে তাকাতেই অতনু দেখে লেদমেশিনওয়ালা গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে পান খাওয়া কালো কালো দাঁত বের করে ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছে আর বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলছে, 'পারবে না, ওর সঙ্গে পারবে না। সারা জীবন কত অক্ষর ও সাজিয়েছে আর কত অক্ষর ভেঙ্গেছে তার হিসেব করেছ কখনও। এখন তো ও নিজেই একটা বর্ণ পরিচয়।'

'তা ওখানে বসে তুমি কি করছ?' বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করে অতনু।

'গাছের গায়ের ফুটোগুলো দেখছি। কি রকম ড্রিল দিয়ে ছেঁদা করেছে দেখতে হবে না।' এই বলে এক মনে গাছের গায়ে ফুটো খুঁজতে লেগে গেল।

এমন সময় কোথা থেকে একটা দমকা হাওয়া এসে লেদমেশিনওয়ালার কাপড়ের তৈরি টুপি উড়িয়ে নিয়ে গেল। গাছ থেকে এক লাফে নেমে টুপির পেছন পেছন দৌড়তে লাগল লেদমেশিনওয়ালা। অমনি দেখা গেল কোথা থেকে একরাশ ছেলেমেয়ে ওই টুপির পেছনে ছুটতে শুরু করে দিয়েছে। অতনু অবাক হয়ে ভাবছে, এত

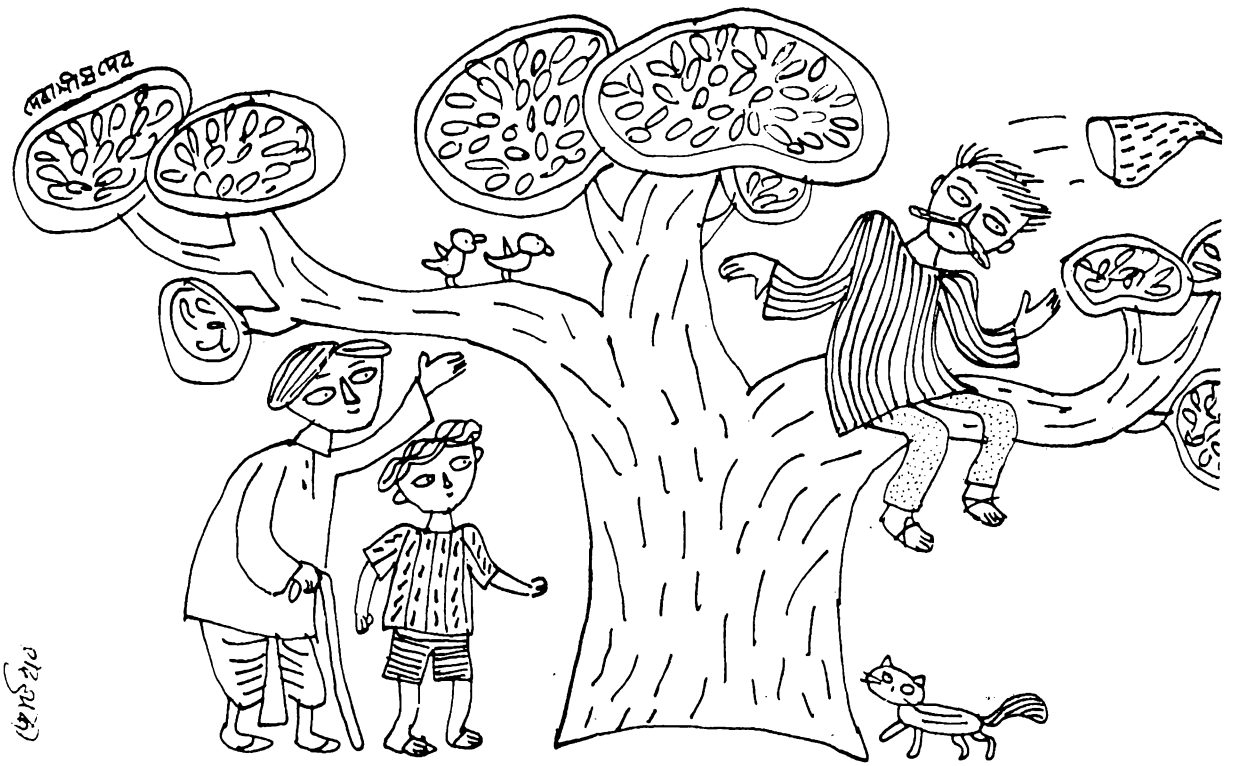

ছেলেমেয়ে হঠাৎ এখানে এল কোত্থেকে!

'কোত্থেকে আবার, ঝাঁপে খাপে ছিল। ঠিক জানত টুপি উড়বে।' হরেনবাবুর উত্তর যেন তৈরিই ছিল, প্রশ্ন করারও দরকার হলো না।

এদিকে সেই যে দমকা হাওয়া এসেছিল, সে আর থামে না। টুপিও উঁচু থেকে আরও উঁচুতে উঠতে লাগল। হাওয়ার টানে টানে আকাশ জুড়ে হৈ-হৈ করে ছুটে এল কালো মেঘের দল। অতনু তাড়াতাড়ি হরেনবাবুকে বলল, 'নিন, উঠে পড়ুন, না হলে বৃষ্টিতে ভিজতে হবে।'

'কি করে ভিজবে? বৃষ্টি হলে তবে ত'।' নির্বিকার মুখে উত্তর দেন হরেনবাবু।

'তা মেঘ করলে বৃষ্টি হবে না ত' কি রোদ উঠবে!' অতনু বেশ ঝাঁজের সঙ্গেই কথাগুলো বলল।

'বলি বৃষ্টিটা হবে কি করে? কেউ ছাতাই খোলেনি, বৃষ্টি হলেই হল। এ কি মামার বাড়ি নাকি!'

'বৃষ্টি পড়লে তবে ত' লোকে ছাতা খুলবে।'

'না, না, কিস্যু জান না। ছাতা খুললে বৃষ্টি পড়বে। তার চেয়ে বরং এসো, তোমাকে একটা গান শোনাই।

'হাওয়া লেগে উড়ে গেল টুপি
তাই দেখে গুপি চুপিচুপি
আকাশেতে চলে জ্বেলে কুপি
টুপি ছেড়ে গুপি ...

'তারপর কি যেন? হ্যাঁ, কি সব ধুমকেতু-টুমকেতু ঠিক মনে আসছে না, তবে একটা ওস্তাদি গান আছে, গলায় একসঙ্গে সাতটা সুর খেলাতে হয়। হুঁ, খুব কঠিন। সব্বাই পারে না। এমন কি আমিও ঠিক মতো পারি না। যাই হোক, ধুমকেতু দেখবে? তাহলে তাড়াতাড়ি এসো আমার সঙ্গে।' এই বলে অতনুকে টানতে টানতে এক জায়গায় নিয়ে এলো।

চারদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার, মাঝখানে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে একটা ষন্ডা মতো লোক। ঘামে ভেজা গা দিয়ে যেন তেল গড়িয়ে পড়ছে।

'এই হল ধুমকেতু। লোকটার নাম কেতু। ও সব সময় ধোঁয়ার মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকে।'

অতনু তীব্র প্রতিবাদ করল। 'মোটেই এটা ধুমকেতু নয়। ধুমকেতু আকাশে দেখা যায়, তার ঝাঁটার মত মস্ত একটা ল্যাজ আছে।' এই বলে হরেনবাবুর দিকে তাকাতেই দ্যাখে হরেনবাবুর মুখ থেকে কান দুটো উধাও হয়ে গেছে। চশমার ডাঁটি ঝুলে পড়েছে গালের দু'পাশে। সে যা রূপ খুলেছে বলে বোঝানো যায় না। পেটের ভেতর থেকে হাসি গুড়গুড়িয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। অতনু আর সামলাতে পারে না। হাসতে হাসতে নিজের কানে হাত দিয়ে আঙ্গুলের ইশারায় বোঝাতে চায়, আপনার কান কোথায়, হরেনবাবু?

ওমা, ঠিক সেই সময়েই কোত্থেকে এসে কান দুটো ফের ঠিক জায়গায় সেট করে গেছে। দেখে তো অতনুর ভিরমি খাবার যোগাড়।

হরেনবাবু বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'ওসব বাজে কথা আমরা শুনি না। স্পষ্ট দেখা গেল ধুমকেতু, তা বলে কিনা আকাশে থাকে, ঝাঁটার মত ল্যাজ। গুল মারার আর জায়গা পাওনি।'

এবার অতনু ক্ষেপে যায়, 'গুল মেরেছি মানে! যা বলেছি একেবারে বিজ্ঞানসম্মত। আপনিই তো মশাই যা-তা বলছেন—কিচ্ছু শুনিনি বলে সবই শুনেছেন দেখছি।'

হরেনবাবু কি রকম থতমত খেয়ে গেলেন। 'না-না, সবটা তো আর শুনিনি, কিছু কিছু...'

ওপাশ থেকে মস্ত বড় হাঁই তুলে মুখের সামনে পটাপট দু'চারটে তুড়ি মেরে একজন দশাসই চেহারার লোক বাজখাঁই গলায় বলে উঠল—'কি সব বিজ্ঞান-টিজ্ঞান শুনলাম যেন।'

হরেনবাবু শশব্যস্ত হয়ে বললেন, 'না-না, তেমন কিছু নয়। ও বলছিল এখানকার সব কিছুই দেখছি বিজ্ঞান-সম্মত।' এমন ভাবে কথাগুলো বললেন যে অতনু বাধা দেবারও সুযোগ পেল না।

'যাক্ এতদিনে তাহলে অন্তত একজনও বুঝেছে দেশটার সব কিছু বিজ্ঞানসম্মত। তুমি তো বর্ণপরিচয় হয়ে গিয়ে এসব কথা আর মানতে চাওনি', বলে দশাসই ভদ্রলোক হরেনবাবুকে বেশ একটু কটাক্ষ করলেন। তারপর শুরু করলেন লেকচার—

'এই দ্যাখো', বলে পেছন ফিরে ঝাঁটার মত একটা লেজ নাড়াতে লাগলেন।

'সর্বনাশ! এই শুরু হল ভাষণ,' বলেই লোকটা ঘোরার আগেই অতনুর হাত ধরে হরেনবাবু ঝড়ের বেগে সেখান থেকে তাকে নিয়ে সটকে পড়লেন। ঝড়ের বেগ মানে ঝড়েরই বেগ। রীতিমত একটা ঝড় উঠে গেল। আর সেই ঝড়ের মধ্যে হরেনবাবু বলছেন, 'দ্যাখো উল্টোমুখী ঝড়ে আবার ফিরে আসছে সেই টুপি।'

তাকিয়ে অতনু দ্যাখে টুপির পেছনে এবার লেজ গজিয়েছে—দশাসই এর সেই ঝাঁটা লেজ। চতুর্দ্দিকে ভপ্ ভপ্ করে বাঁশি বেজে উঠতেই মাঠে মাঠে খুলে গেল অসংখ্য ছাতা। রঙিন রঙিন ছাতা। আর সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ভেঙ্গে নেমে এলো বৃষ্টি। নানা রঙের বৃষ্টি—লাল, নীল, হলুদ, সবুজ। বৃষ্টির তেজ যত বাড়ে বাঁশির আওয়াজও বাড়তে থাকে—প্যাঁ-পোঁ, ভোঁ-পোঁ।

অতনুর বুঝতে একটু সময় লাগল। কোথা থেকে আসছে ভোঁ-ভোঁ আওয়াজটা। তারপরেই বোঝা গেল নিচের তলায় গাড়ি সারাবার দোকানে হর্ন সারানো হচ্ছে। বিছানায় পাশ ফিরে জানলার বাইরে তাকাতেই বুঝল বিকেল হয়ে গেছে। হঠাৎ নিচ থেকে হরেনবাবুর খ্যান্‌খ্যানে গলা শোনা গেল। উল্টো দিকের চায়ের দোকানের বয়কে বলছে, 'ভজা দুটো চা—ডবল হাফ।'

ছবি : দেবাশীষ দেব

ছড়া

সুকুমার রায়

বলছি ওরে ছাগল ছানা,
উড়িস্ নে রে উড়িস্ নে।
জানিস্ নে তোর উড়তে মানা—
হাত পা গুলো ছুঁড়িস্ নে।

আবোল তাবোলের গল্প

প্রসাদ রঞ্জন রায়

শোনো শোনো দুটো কথা, এসো বসো ভাইরে
করো নাকো ছটফট—চেও নাকো বাইরে!
এই ঘরে বসে এসো করি খোস গল্প—
আড্ডা জমবে ভালো—চা খাইবে অল্প।
মাতি চলো আবোল আর তাবোলের সঙ্গে
বেয়াড়া, সৃষ্টিছাড়া, আজগুবি রঙ্গে।
যত করো ঠাট্টাই সয়ে যাব মুখ বুজে,
জানো না তো—নোটবই পেয়ে গেছি আজ খুঁজে!
ঝোলাগুড় দিয়ে তাই বানাই সাবান যে,
থেকে থেকে কটকট করে মোর কান যে!
পাগলা ষাঁড়কে জেনো ঠেকিয়েছি ভেংচিয়ে,
খুব জোর বেঁচে গেছি, শুধু চলি লেংচিয়ে।
জগাইদাদাতো থাকে আমাদেরই পাড়াতে
জার্মান বাড়িছাড়া শুধু তার তাড়াতে!

বোম্বাগড়ের রাজা এখন ষড়যন্ত্রী—
অনেক খুঁজে গঙ্গারামকে করেছেন মন্ত্রী।
বুথ সাহেবের বাচ্চাগুলো খোসমেজাজে চেল্লায়
খুড়োমশাই জেনো নতুন কল করেছেন পেল্লায়।
হাতি লোফা ছেড়ে বুঝি ষষ্ঠীচরণ আজ
নাম লিখেছেন সার্কাসে অনেক ভালো কাজ!
গানের রণে ভীষ্মলোচন যখন দিলেন ক্ষান্ত,
ডানপিটে ওই ছেলেগুলো এক্কেবারেই শান্ত!
গোঁফ কার? এই মামলাখানা এক্কেবারে থামিয়ে
বড়বাবু ফেলেছেন গোঁফ তাঁর কামিয়ে।
আমড়াতলার মোড়েতে ঠিক খুঁজে পেলেম রাস্তা
ডজনদুয়েক কলায় হবে হুঁকোমুখোর নাস্তা।
ট্যাঁশগরু দেশে গেছে, সে অনেক দূরে
নাগাল পাইনি তার—বহু ঘুরে ঘুরে।
কুমড়োপটাশ নাচে ঠিক তার সাথে
ন্যাড়া বেলতলা যায় ফুটবল হাতে।
হুলোদের গান আমি শুনি রোজ রাত্রে,
ছায়ারণে ব্যথা লেগে থাকে সারা গাত্রে!
জানলাটি রাত্তিরে ছিল নাকি বন্ধ?
পাইনি তো আকাশের টকটক গন্ধ।
খাইখাই আরো সব ছড়া নিয়ে পাশে—
রামগরুড়ের ছানা মুচকিয়ে হাসে।
শুধু ভাবি বারবার, কোথা আজ তিনি হায়?
অমর স্রষ্টা যিনি, সেই সুকুমার রায়!

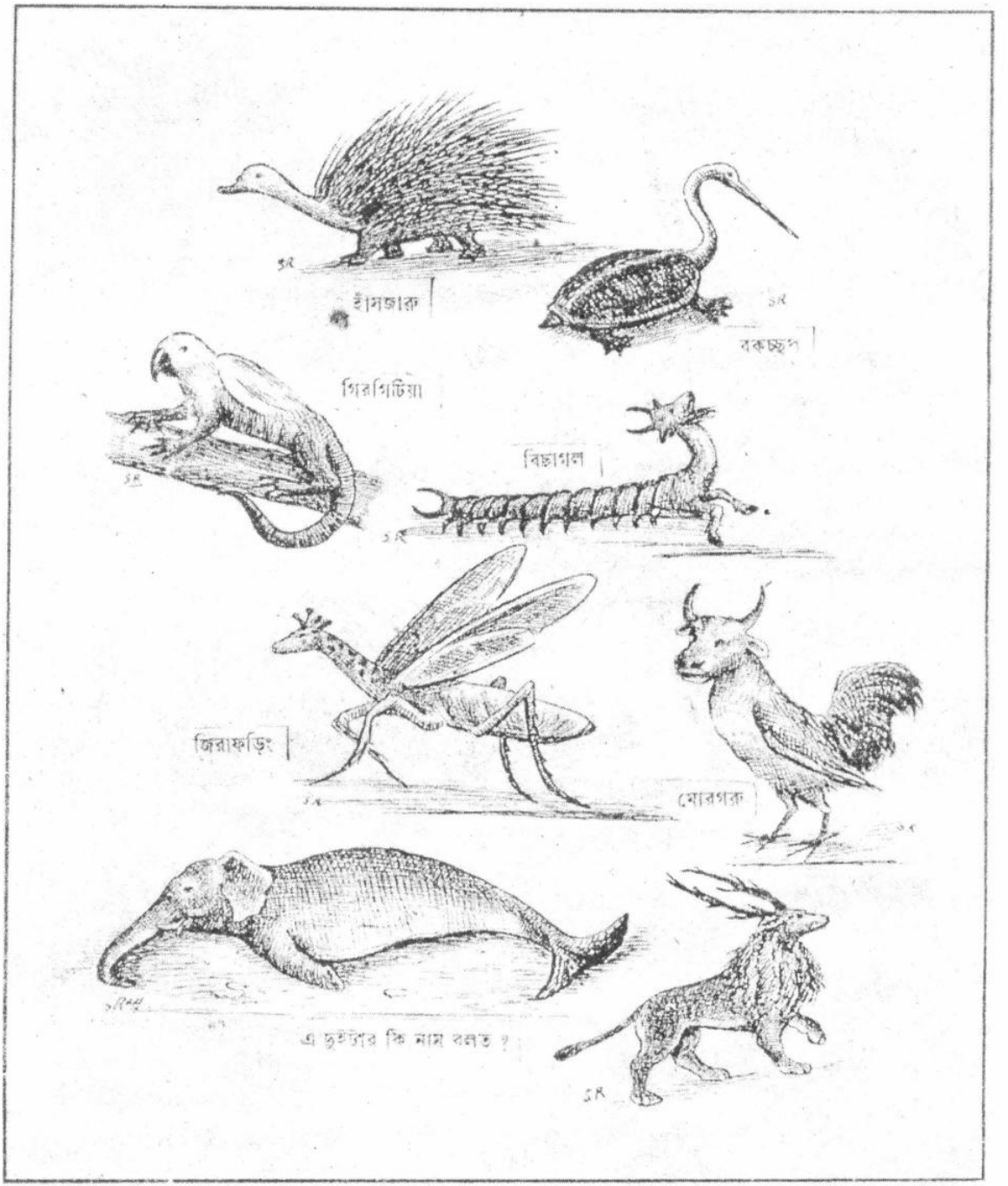
হাঁসজারু
কচ্ছপ
গিরগিটিয়া
বিছাগল
জিরাফড়িং
মোরগরু
এ দুইটার কি নাম বলত ?

'সন্দেশ'এ আবোল তাবোল

'আবোল তাবোল' বইয়ের অধিকাংশ কবিতাই প্রথম 'সন্দেশ'এ বেরোয়। প্রকাশের পর কিছু কবিতা সুকুমার নিজে হাতে সংশোধন করেন। সেই সব পাতার কয়েকটি ফটোকপি এখানে দেওয়া হ'ল।

আর যে ছবিগুলি দেখছ, তার একটিও কিন্তু বইতে স্থান পায়নি। সুকুমার আবার নতুন করে সে ছবি এঁকেছিলেন।

খিচুড়ি।

'হাঁস ছিল—সজারু' (ব্যাকরণ মানি না)
হ'য়ে গেল হাঁসজারু কেমনে তা জানি না।
বক কহে কচ্ছপে—"~~মনে ভারি~~ ফূর্ত্তি—
অতি খাসা আমাদের বকচ্ছপ মূর্ত্তি"।
টিয়া-মুখো গিরগিটি, মনে ভারি শঙ্কা
পোকা ছেড়ে শেষে কিগো খাবে কাঁচা লঙ্কা ?
ছাগলের পেটে ছিল না জানি কি ফন্দি—
চাপিল বিছার ঘাড়ে—ধড়ে মুড়ো সন্ধি !
জিরাফের সাধ নাই মাঠে ঘাটে ঘুরিতে
ফড়িঙের ঢং ধরি সেও চাহে উড়িতে !
গরু বলে 'আমারেও ধরিল কি ও' রোগে ?
মোর পিছে লাগে কেন হতভাগা মোরগে ?

আবোল তাবোল।

হাঁড়ি নিয়ে দাড়ি মুখো কে-যেন কে বৃদ্ধ,
রোদে ব'সে চেটে খায় ভিজে কাঠ সিদ্ধ।
মাথা নেড়ে গান করে, গুণ গুণ সঙ্গীত,
{ভাব দেখে মনে হয় না-জানি কি পণ্ডিত}।
বিড়্ বিড়্ কি যে বকে নাহি বুঝি অর্থ—

"আকাশেতে ঝুল্ নাই, কাঠে কেন গর্ত্ত?"—
টেকো মাথা তেতে ওঠে গায়ে ছোটে ঘর্ম্ম,
রেগে বলে "কেবা বোঝে এসবের মর্ম্ম—
আরে মোলো, যে মাতারা একেবারে অন্ধ,
~~বুদ্ধির ঢেঁকি যারা নাহি চিরি চন্দ।~~
কোন্ কাঠে কত রস সেদিকেতে মন নাই—
~~কাঠকে যে কাষ্ঠ কয়, এত বড় অন্যায়~~!
~~তারা কি মানুষ? তারা~~ জানে কোন তত্ত্ব—
পূর্ণিমার রাতে কেন কাঠে হয় গর্ত্ত?"

আশে পাশে হিজিবিজি আঁকে কত অঙ্ক,
ফাটা কাঠ ফুঁটো কাঠ হিসাব অসংখ্য ;
কোন্ ফুঁটো খেতে ভাল কোন্‌টা বা মন্দ,
কোন্ কোন্ ফাটলের কি রকম গন্ধ।
কাঠে কাঠে ঠুকে করে ঠকাঠক্ শব্দ,
বলে "জানি কোন্ কাঠ কিসে হয় জব্দ।
কাঠকুটো ঘেঁটেঘুঁটে জানি আমি পষ্ট,
একাঠের বজ্জাতি কিসে হয় নষ্ট।
কোন্ কাঠ পোষমানে, কোন্ কাঠ শান্ত,
কোন্ কাঠ টিম্‌টিমে কোন্‌টা বা জ্যান্ত।
কোন্ কাঠে জ্ঞান নাই মিথ্যা কি সত্য,
আমি জানি কোন্ কাঠে কেন থাকে গর্ত্ত।"

আবোল তাবোল (লড়াই-ক্ষ্যাপা)। বৈশাখ ১৩২২

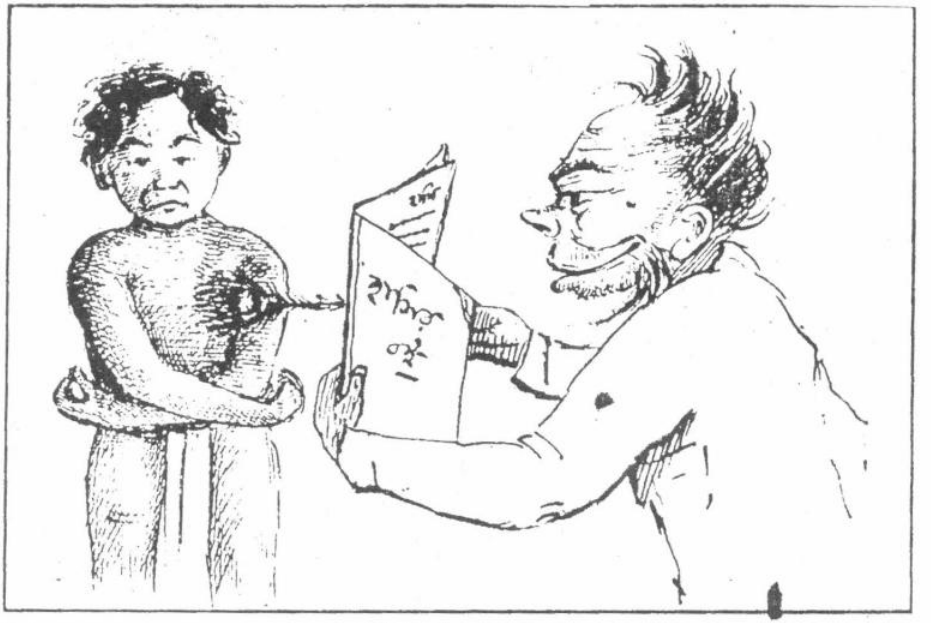

কাতুকুতু বুড়ো।
জ্যৈষ্ঠ ১৩২২

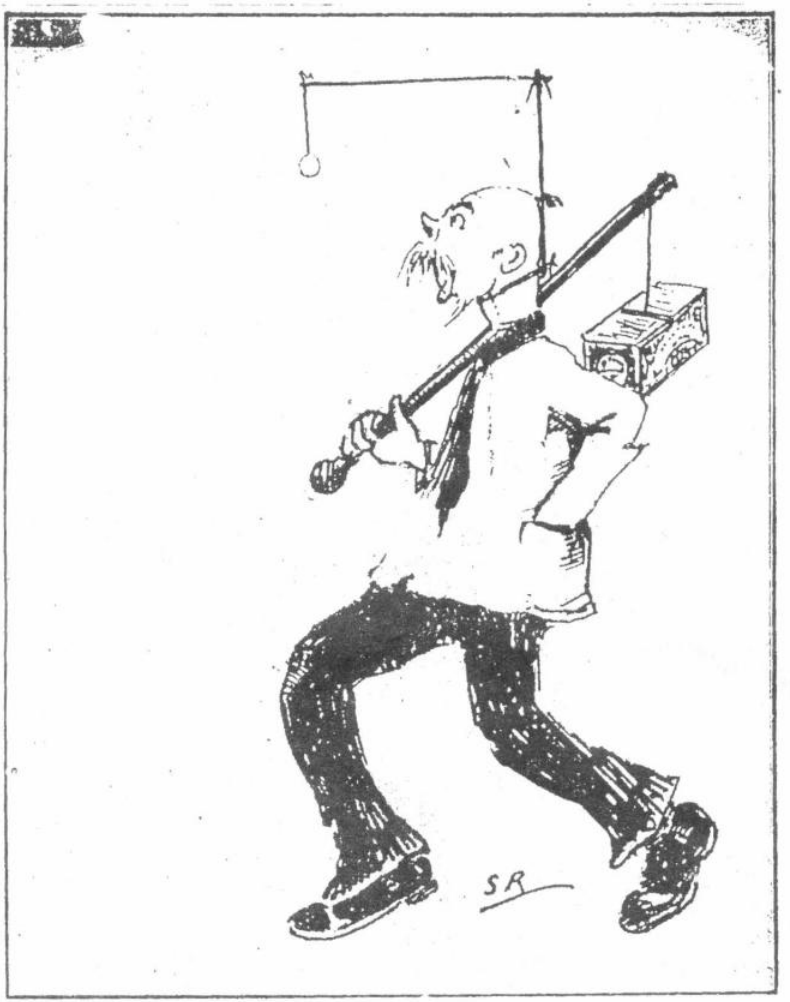

আবোল তাবোল (খুড়োর কল)।
ফাল্গুন ১৩২২

আবোলতাবোল

এক যে ছিল রাজা—(থুড়ি,
রাজা নয় সে ডাইনী বুড়ি) !
তার যে ছিল ময়ূর—(না না,
ময়ূর কিসের ? ছাগল ছানা)।
উঠানে তার থাক্‌ত পোঁতা—
—(বাড়ীই নেই, তার উঠান কোথা) ?
শুনেছি তার পিশ্‌তুতো ভাই—
—(ভাই নয়ত, মামা-গোঁসাই)।
বল্‌ত সে তার শিষ্যটিরে—
—(জন্ম-বোবা, বল্‌বে কিরে !)
যা হো'ক, তারা তিনটি প্রাণী—
—(পাঁচটি তারা, সবাই জানি) !
থও না বাপু খ্যাঁচাখেঁচি
—(আচ্ছা বল, চুপ ক'রেছি) ॥
তার পরে সেই সন্ধ্যাবেলা,
যেম্নি না তার ওষুধ গেলা,
অম্‌নি তেড়ে জটায় ধরা—
—(কোথায় জটা ? টাক যে ভরা) !
~~হোক্‌না টেকো, হোক্‌না বুড়ো,~~
ধর্‌ব ঠেসে টুঁটির চুঁড়ো ;
~~হোক্‌না বামুন হোক্‌না মুচি~~
~~কাট্‌ব তেড়ে কুচি' কুচি'~~ ;
~~খিট্‌ব তোরে হাড়ে মাসে,~~
~~দে দমাদম্ আড়ে পাশে~~।
এখন বাছা পালাও কোথা ?
গল্প বলা সহজ কথা ?

(গল্প বলা)। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪

আবোল তাবোল

ছুট্‌ছে মোটর ঘটর ঘটর ছুট্‌ছে গাড়ী জুড়ী
ছুট্‌ছে লোকে নানান্ ঝোঁকে কর্‌ছে হুড়োহুড়ি
ছুট্‌ছে কত খ্যাপার মত পড়্‌ছে কত চাপা
সাহেব মেমে থম্‌কে থেমে বল্‌ছে—"মামা ! পাপা !"
—আমরা তবু তবলা ঠুকে গাচ্ছি কেমন তেড়ে—
"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্—! দেড়ে দেড়ে দেড়ে" !

(দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্)। আষাঢ় ১৩২৪

বর্ষাকালের বৃষ্টিবাদল রাস্তাজুড়ে কাদা
ঠাণ্ডা রাতে সর্দ্দি বাতে মরবি কেন দাদা ?
হোক্‌না সকাল হোক্‌না বিকাল হোক্‌না দুপুর বেলা
থা'ক্‌না তোমার আপিস যাওয়া থা'ক্‌না কাজের ঠেলা—
এই দেখ না চাঁদ্‌নী রাতের গান এনেছি কেড়ে—
"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্—! দেড়ে দেড়ে দেড়ে" ।

মুখ্যু যারা হ'চ্ছে সারা পড়্‌ছে ~~তারা নামতা~~
কেউবা দেখ কাঁচুরমাচুর কেউবা ~~করে আমতা~~ !
কেউবা ভেবে হদ্দ হ'ল ~~কেউবা নাকে চুলকায়~~
কেউবা ব'সে বোকার মত মুণ্ডু ~~নেড়ে দোল খায়~~ !
তার চেয়ে ভাই, ভাবনা ভুলে গাওনা গলা ছেড়ে—
"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্—! দেড়ে দেড়ে দেড়ে" ॥

বেজার হ'য়ে যে যার মত করছ সময় নষ্ট —
হাঁট্‌ছ কত, খাট্‌ছ কত, পাচ্ছ কত কষ্ট !
আসল কথা বুঝ্‌ছ না যে করছ না যে চিন্তা
শুনছ না যে গানের মাঝে তব্‌লা বাজে ধিন্‌তা ?
পাল্লা ধ'রে গায়ের জোরে গিট্‌কিরি দাও ঝেড়ে—
"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্—! দেড়ে দেড়ে দেড়ে" !

সুকুমার রায়চৌধুরী, বি-এস্-সি, এফ্-আর-পি-এস্ প্রণীত

আবোল তাবোল

বাহির হইয়াছে।
পাতায় পাতায় হাসি, পাতায় পাতায় মজার ছবি !
সুন্দর মোটা কাগজে ছাপা, চমৎকার রঙ্গিন মলাট,
মজবুত বাঁধাই।
উপহারের এমন বই আর নাই।

দাম ৸৵০ আনা।

সন্দেশ কার্য্যালয়, ৭২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন (সন্দেশ। আশ্বিন ১৩৩০)

খসড়া

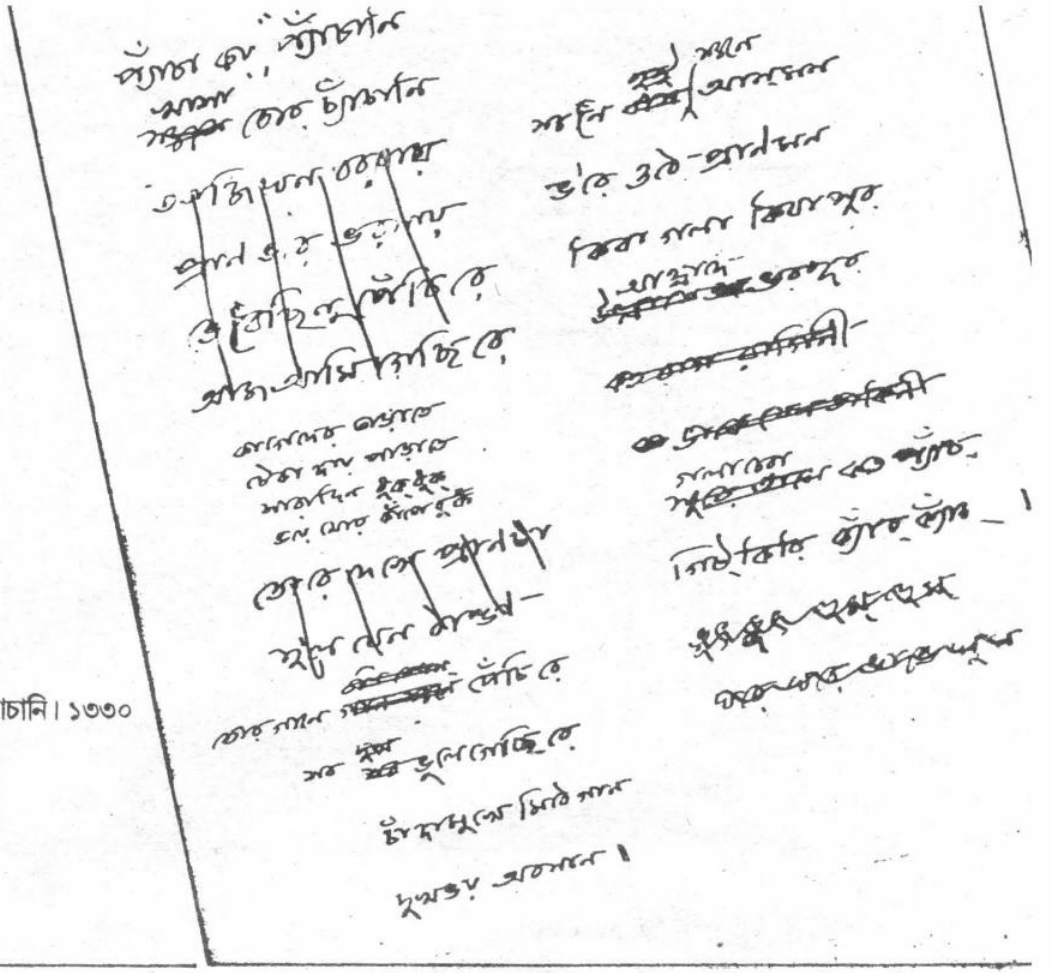

প্যাঁচা আর প্যাঁচানি। ১৩৩০

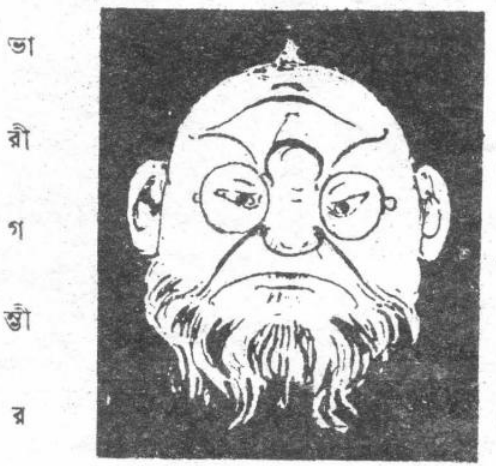

এইত দেখ্‌ছ কেমন খিট্‌খিটে বদ্‌ মেজাজী লোকটি—কিন্তু উল্টিয়ে দেখ ত!

নূতন ধাঁধা।

(সন্দেশ। কার্তিক ১৩২২)

প্রণব মুখোপাধ্যায়

সত্যিই আবোল তাবোল

??????????????????????

যে কোন মহৎ সাহিত্যই একবার পড়লে শেষ হয়ে যায় না। বার বার চেখে দেখতে হয়, নানা ভাবে স্বাদ নিতে হয় তারিয়ে তারিয়ে, জীবন ভোর। এক এক সময় এক এক রকম লাগে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রস মজতে থাকে। নানা রকম অর্থ আর ব্যঞ্জনা মিলে যায় তলে তলে। 'আবোল তাবোল' একটা ছোট্ট, সামান্য বই অথচ এর স্বাদ ফুরোয় না। কেন, সেটাই ভেবে দেখার চেষ্টা করেছি বার বার।

নামটাই তো বলে দিচ্ছে এটা একটা তুচ্ছ ওলট পালোট। কাজেও দেখছি তাই। এই দুনিয়া থেকে দলছুট কিছু ক্ষ্যাপাটে মানুষজন আর জন্তু জানোয়ার নিয়ে হাসি মস্করা। অথচ এর এত বৈভব যে দিনে দিনে তা নতুন হচ্ছে, চিরকালই হয়ে থাকছে টাটকা, আজকের লেখা। ছেলে বুড়ো সবার কাছে। তাহলে ম্যাজিকটা কোথায়?

আজগুবি আর উদ্ভট নিয়ে কারবার সাহিত্যে এই প্রথম নয়। অথচ মজার কারিগরীতে 'আবোল তাবোল'এর একটা আলাদা জায়গা। 'আবোল তাবোল' এর নিজস্ব একটা জগৎ আছে। সেখানকার নিয়ম কানুন কি রকম? হুগলীর সেই তিনটে শুয়োরের কথা মনে পড়ছে? তাদের মাথায় টুপি নেই। মজার কারবারীরা এতদিন জীবজন্তুর মাথায় টুপি পরিয়েছেন। 'আবোল তাবোলে'র কারিগরি এই টুপি না থাকায় আশ্চর্য হয়েছেন। এই আশ্চর্য ধাঁচের এক অতি নিজস্ব 'নিয়ম'-এর রাজ্য স্বাতন্ত্র এনেছে কৌতুক সাহিত্যে। সেটাই ম্যাজিক, আর এই ম্যাজিক পরিমন্ডলেই গড়ে উঠেছে রাজা উজির, মানুষজন, জন্তু জানোয়ার। গজিয়ে উঠেছে কিছু প্রশ্ন। প্রশ্নগুলো অবশ্য তলে তলে। নির্জীব, নিরীহ প্রাণীকে সাপ আখ্যা দিয়ে কেন যে মানুষ ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে আর পেশী ফোলায়! যা আছে তা ভুলে গিয়ে যে সব তার নেই তা নিয়ে মানুষের কেন যে এত হা হুতাশ! আর তার থেকেই তো সৃষ্টি হয় কদাকার এক 'কিম্ভুত'। সৃষ্টিছাড়া

রাজ্যে সে সব পেয়ে গিয়েও নামগোত্রহীন এক জীব—
'নই জুতা, নই ছাতা, আমি তবে কেউ নই?'
এই পরিচয়হীনতা কি মর্মান্তিক!

'প্রপঞ্চময় পঞ্চতরু'র তত্ত্ব মানুষের জীবনে কি কাজে লাগবে? এই সব দার্শনিক চিন্তার পিছনে সময় ব্যয় করার কোন যুক্তি আছে কি? মানুষের তৈরি ভাষার ব্যাকরণে সত্যিই কোন সঙ্গতি আছে কি? থাকলে, পটকাও ফোটে, ফাটে, আবার ফুলও ফোটে কী করে? চাকাও ঘোরে, চিন্তাও ঘোরে কী নিয়মে? দুঃখেও বুক 'ফাটে' কী যুক্তিতে? আর আছে কিছু চিমটি, যা রাগের প্রকাশ নয়, রসিকতার উদ্ভাস মাত্র। ভালোবাসার জনের যেন একটু পিছনে লেগে মজা পাওয়া। লোভের গন্ধ ছাড়া মানুষ এক পা নড়ে না। তাই ঘাড়ে চন্ডীদাসের খুড়োর কল এঁটে লুচির পিছনে সে বেদম ছুটল। হেড আফিসের বড়বাবু, সমাজে তাঁর বিরাট সম্মান প্রতিপত্তি। তিনি আছেন অথচ তাঁর প্রতিপত্তির ধ্বজা, গোঁফটি বদল হয়ে গেছে বলে তাঁর মনে হচ্ছে। একটা লাগসই গোঁফের অভাবে তাঁর নিজেকে খুবই নিম্নগোত্রের মানুষ বলে মনে হচ্ছে—'এমন গোঁফ তো রাখত জানি শ্যামবাবুদের গয়লা।' সামাজিক অবস্থান নিয়ে তাঁর এই মানসিক সংকট কেউ নিরসন করতে পারছে না। আর তাই কি ধুন্ধুমার কান্ড—

'এ গোঁফ যদি আমার বলিস করব তোদের জবাই।
এই না বলে জরিমানা কল্লেন তিনি সবায়।'

ভোজের বাজির ভেল্কি সব সময় কাজ দেয় না। চিড়িয়া যায় উড়ে। শূণ্য ধামা হাতে পাঁজরায় তীর বিঁধে কান্নাকাটি করতে হয়—

'ঘ্যাঁচ করে তোর পাঁজর ঘেঁষে
লাগল কি বান ছটকে এসে ফট্?'

আবার দেখ, গন্ধ নিয়ে রাজসভায় কি হুলুস্থুল কান্ড! রাজা এবং রাজবাড়ির ব্যাপার। সামান্য সন্দেহের তলে তলে দানা বেধে আছে কত অভিসন্ধি, ষড়যন্ত্র। মনে পড়ে যায় আজকের কালের লোক ঠকানো টাইম বোমার বাক্সের কথা। কেউ ছুঁতে চায় না। সামান্য, নির্দোষ বাক্সটি যে ছুঁতে পারে সে বীরের সম্মান পায়। আর কত বলব? তবে ফের বলি, এ সব আজগুবী, ধুন্ধুমার কান্ডের রাজ্যে নিজস্ব নিয়ম একটা আছে, যেটার নাম শিল্পের শর্ত, নইলে যা কিছু লাগাম ছাড়া, খেয়ালী প্রলাপ তাই 'আবোল তাবোল'-এর মর্যাদা পেত।

'আবোল তাবোল'-এর এই আজগুবী রসটির সংজ্ঞা হয় না, শুধু অনুভবেই এটা টের পাওয়া যায়। আর সত্যিকার রসিক চেনার কষ্টিপাথর এই 'আবোল তাবোল'। আমার এক মাষ্টারমশাই সাহিত্যের নানা জমিতে বিচরণ করেন, নিমগ্ন থাকেন নানা রস বিচারে। ভারী ভারী বইও

লিখেছেন দেশী বিদেশী কবি সাহিত্যিকদের ভাঁড়ার ঘেঁটে। সে সব গুরুগম্ভীর আলোচনায় হাস্যরসেরও ঠাঁই আছে। তিনি সে সবে হাসছেন। তারপর ক্লান্ত দেহ মনে একটু বিশ্রাম নিতে নিতে আড্ডার মাঝে হঠাৎ কোন প্রসঙ্গে 'আবোল তাবোল'-এর কোন লাইন উঁকি দিয়ে গেলেই একটা অদ্ভুত কৌতুকময়তায় তাঁর মুখটা ঝলমল করত, তাঁর সমস্ত ক্লান্তি যেন দূর হয়ে যেত। এই হাসিটা যেন তাঁর বড় নিজস্ব। এই সামান্য বইটার এইখানেই জয়। ঠিক এইভাবেই হেসেছেন মনীষীরা। দেড়শো বছর আগে ইংল্যান্ডে যখন লিয়র সাহেব বাজনা বাজিয়ে গান গেয়ে পেঁচা আর পুসি বেড়াল নিয়ে হুল্লোড় তুলেছেন, জাম্বলী কন্যাদের ছাঁকনিতে চড়িয়ে সাগর যাত্রায় পাঠিয়েছেন, কোয়াঙ্গল ওয়াঙ্গালকে আজব টুপি পরিয়েছেন, মানুষে পতঙ্গে হাত ধরাধরি করে নাচিয়েছেন তাঁর ছড়ায়, তখন হঠাৎ মনীষী জন রাস্কিন দুম করে লিয়রকে বাছাই একশো কবির প্রথম নম্বরে বসিয়ে দিয়েছেন। বলে রাখা ভালো এই প্রাজ্ঞ রাস্কিন তখন তাঁর যুগের সাংস্কৃতিক অবক্ষয় নিয়ে মহা চিন্তিত ছিলেন এবং তাঁর রাশভারী চিন্তার খোরাকে পন্ডিত মহলে তোলপাড় হচ্ছিল। আসলে সবের উর্ধ্বে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন হাসি হুল্লোড়, ঠাট্টা মস্করার মূল্য। লিয়র যখন তাঁর আজগুবী দুনিয়ায় স্বভাব বৈরি প্যাঁচা পুসির বিয়ে দেন, চাঁদের আলোয় ভাসা বালিয়াড়িতে যখন বসে যায় নাচের আসর, তখন সমস্ত বাচ্চার সঙ্গে রাস্কিনও মনে মনে নিশ্চয়ই নাচ জুড়েছিলেন। তিনিই বলেছিলেন রসিক চেনার সহজ উপায় হল লিয়র পড়ে সে হাসে কিনা সেটা দেখা।

প্রত্যেকের এই নিজস্ব হাসির দুনিয়াটা যখন অন্যের সঙ্গে মিলে যায় তখন মানুষ আর এক মানুষকে সব থেকে আপন মনে করে। রণাঙ্গনে যে সৈনিকটির বুকটা গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল সে জার্মান নয়, রাশিয়ান নয়, জাপানী নয়, ইংরেজ নয়; সে মানুষ। হয়ত তারও একটা নিজস্ব হাসির স্থল ছিল যার সঙ্গে তার শত্রুর মনটাও মিলে যায়। তারা তা জানতেই পারল না! বাঁই বাঁই করে শুধু পাগলা জগাইয়ের মত ছাতা ঘুরিয়ে অপরকে মারল আর নিজেও মাথা ঘুরে মরল। যুদ্ধ আর দেশপ্রেমের নামে রোমাঞ্চিত বোকা শহীদের নামই তো পাগলা জগাই! তার চেয়ে নিজস্ব হাসির জায়গাটিতে এসে দাঁড়িয়ে গলাগলি করে বলতে ভালো লাগে, 'এই দুনিয়ার সকল ভাল', আসল নকল সস্তা দামী, সেই সঙ্গে তুমি এবং আমি। কেউ খারাপ নই। এসো 'আহ্লাদী'দের মত দুনিয়াটা দেখি আর হাসি। হাসির জটলায় ভরে দিই, গুজ গুজ ফুসফুস বিষমন্তর উবে যাক। মেঘ মাখানো আকাশ, ঢেউ জাগানো বাতাসের সঙ্গে সুকুমার মিলিয়ে দিয়েছেন পাঁউরুটি আর ঝোলাগুড়কে। প্রকৃতি সবার—তার অবাধ ঐশ্বর্য এসে ছুঁয়েছে শ্রমজীবী পৃথিবীকে। নৌকো ফানুস পিঁপড়ে মানুষ রেলের গাড়ী তেলের ভাঁড় এসে বসেছে এক পংক্তিতে। আপাত অসঙ্গতির মধ্যে দিয়ে রিণরিণ করে উঠেছে একটা সঙ্গতির সুর। এই সুরটাই বুড়ো আঙ্গুল দেখাতে পারে মৃত্যু নামক সব থেকে নির্মম প্রহসনটিকে। 'মেঘ মুলুকে ঝাপসা রাত' আর 'রামধনুকের আবছায়া' যখন জীবনের সবচেয়ে রূঢ় সত্য, তখন হাসি ছাড়া গতি নেই। হাসি দিয়ে মৃত্যুকে জয় করতে শেখায় 'আবোল তাবোল'। ঠিক যেমন ভাবে করেছিলেন সুকুমার রায়।

তাই বলি আবোল তাবোল কথাটির মানে যাই হোক, 'আবোল তাবোল' তুচ্ছ নয়। আসলে তুচ্ছতার ভানে

নিজেকে একটু আড়ালে রেখে মজার রামগরুড়ের ছানা, হুঁকোমুখো হ্যাংলা কিম্বা শিংওয়ালা 'ভয় পেয়োনা' মার্কা দেওয়া জানোয়ারটিকে এগিয়ে দেওয়া। সত্যিকার শিল্পীদের এই আড়ালটুকুর প্রয়োজন হয়। আমাদের মাঝে এই জন্তুগুলি মোটেই বিরল নয়। 'ভয় পেয়োনা'র অভয়বাণীতে কি বিশ্বাস রাখা যায়? নীতিজ্ঞানের দম বন্ধ করা গাম্ভীর্যই তো 'রামগড়ুরের বাসা'! কিংবা হাজির করা 'ফুটোস্কোপ' হাতে সেই বৈজ্ঞানিক আর ষাঁড়ের তাড়া খাওয়া পুঁথি পড়ুয়াটিকে। সে বুড়ীটার কথাই ধর। কাঠিটাঠি দিয়ে ঠেলে গুঁজে, থুতু দিয়ে চেটে জুড়ে থুড়থুড়ে প্রাচীন দেহে মনে কি পরিশ্রমে বাঁচিয়ে রেখেছে তার প্রাচীন বিশ্বাসের বাসভূমিটিকে!

'এই দেখ পেন্সিল নোটবুক এ হাতে' পড়লেই মনে পড়ে যায় ডিকেন্সের 'হার্ড টাইম্‌স্'-এর মিঃ গ্যাড গ্রাইন্ডের ইস্কুলটিকে। সেখানে তথ্য নির্ভর সব সংজ্ঞা মুখস্থ করানও হয়। যেমন, ঘোড়ার ক'টি পা, ঠিক ক'টি দাঁত, কোন পাটিতে কি নামের ক'টি বিশেষ দাঁত ইত্যাদি। জন্তুটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সুযোগও নেই, প্রায়োজনও নেই। জরুরি হল তথ্যগুলি কণ্ঠস্থ রাখা। সার্কাস দলের ছোট্ট মেয়ে সিসি ঘোড়াকে সব থেকে ভালো চেনে জানে। অথচ এ সব তথ্য গিলতে পারে না বলে তার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে। আর সার্কাস দলের সঙ্গে থাকার অপরাধে শেষ পর্যন্ত সে ইস্কুল থেকে বিতাড়িত হয়। 'আবোল তাবোল'-এ নোটবুক তৈরি করা মানুষটিকে নিয়ে যে তামাশা জমেছে তা এই ধরণের তথ্য-নির্ভর মননশীলতা আর কল্পনাহীন জ্ঞানচর্চার প্রতিই যেন মৃদু খোঁচা। ডিকেন্সের মত বিদ্রূপ কিংবা রাগ করে নয়, স্রেফ মজা জমিয়ে। 'কাতুকুতু দিলে গরু কেন করে ছটফট?' কারণটি মুখস্থ বলতে না পারলে তুমি ফেল। অর্থ আর সংজ্ঞা টুকে টুকে নোটবই বোঝাই করে মানুষটি ভাবছে যে তার জ্ঞানের পরিধি বুঝি বিস্তৃত হচ্ছে।

'আবোল তাবোল' পড়তে পড়তে এসব কথা মনে হয়। এসব নানা চিন্তা জাগে আপনা আপনি, মজার মোড়কে ঢাকা অদ্ভুত মানুষ আর প্রাণীগুলোর আচরণে, নানা আবোল তাবোল উচ্চারণে।

'আবোল তাবোল' কি সত্যিই আবোল তাবোল?

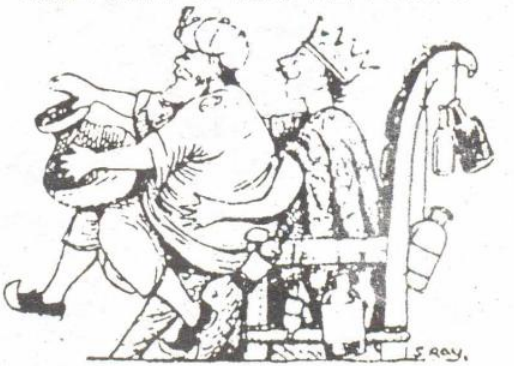

নাকের বদলে

হিমন মুখোপাধ্যায়

তুচ্ছ একটা ঘটনা কিভাবে অজস্র মানুষ, বানর, রাক্ষসের জীবনধারা আমূল বদলে দিতে পারে, রামায়ণ তারই আখ্যান। আদি কবির সামান্য বিভ্রমের খেসারত দিয়ে গেল সব চরিত্রগুলো।

'রামায়ণ'-এ এই যে এত যুদ্ধ, মৃত্যু, হাহাকার, অশ্রুজল —এর উৎপত্তি কি ভাবে? দশরথের হরিণ শিকার অভিলাষ থেকে ঘটনার গতিবিধি পর্যালোচনা করার প্রয়োজন নেই। বনবাসকালে একটা নকনের অভাব শুধু ঘনিয়ে আনল সর্বনাশ। শূর্পনখার নাকটি কেটে তাঁর হাতে যদি একটা নরুন ধরিয়ে দেওয়া যেত, কাটা নাকের বদলে নরুন পেয়ে শূর্পনখা টাক ডুমা ডুম্ ডুম্ এক পাক নেচে নিতেন খুশিতে, দাদার কাছে কাঁদুনি গাইতে যেতেন না। রাম অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। 'নাকের বদলে নরুন'—এই সহজ সমাধান তাঁর মাথায় খেলবে না, এ অকল্পনীয়। গোলমালটি পাকিয়েছেন বাল্মীকি। এত দূর কাহিনী গড়িয়ে এনে কবিত্ব ফলাবার এমন চমৎকার সুযোগখানি হাত ফস্কে যায় দেখে তিনি সকল মুস্কিল আসানের পথ মাড়ালেনই না। বীররস আর করুণরসের দাপটে গোটা একটা লঙ্কা জ্বালালেন, যুদ্ধ বাঁধালেন, রাক্ষসমেধ যজ্ঞে ষোড়শোপাচার সাজালেন, তারপর চোখের জলে গোটা একটা সরযূ নদী রচনা করে ফেললেন। সারা বিশ্বের মানুষ একটা মহাকাব্য পড়ার সুযোগ পেল কেবলমাত্র ক্ষুদ্র অবজ্ঞেয় একটা নরুনের জন্য।

হাত পাকাবার আসর

- হাত পাকাবার আসর শুধুমাত্র ১৭ বছরের কম-বয়েসি 'সন্দেশী' গ্রাহক -গ্রাহিকাদের জন্য।
- 'সন্দেশ'-সম্পাদকদের পছন্দ অনুযায়ী গল্প, ছড়া ও কবিতা, ছবি, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, ধাঁধা ইত্যাদি সবকিছুই ছাপানো হয়।
- ছাপার জন্য যে কোনও লেখা কাগজে একদিকে পরিষ্কার করে লিখবে। ছবি আঁকতে হলে শুধুমাত্র কালো কালি ব্যবহার করবে। যে-সব স্কুল, ক্লাব ও লাইব্রেরি 'সন্দেশ'-এর গ্রাহক সেখানকার সমস্ত ছাত্র বা সদস্য
- 'হাতপাকাবার আসর'-এর জন্য ছবি ও লেখা পাঠাতে পারো। সব লেখা ও ছবির সঙ্গে তোমার নাম, গ্রাহক নম্বর ও বয়েস স্পষ্ট করে লিখবে।

পি • সি • চন্দ্র

জু • য়ে • লা • র্স

সন্দেশীরা শোনো, ভারী মজার খবর! বিখ্যাত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান **পি. সি. চন্দ্র এন্ড সন্স** তোমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ছোটদের কচি হাতে 'বড়' কাজ হয় 'হাত-পাকাবার আসর'-এ, তাই খুশি হয়ে বড় মানুষেরা এগিয়ে এলেন সাহায্য করতে। ভালো খবর নয়? তোমরাও আঁকায় লেখায় ওই প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের গুণপনা দেখিয়ে খুশি করো।

দীপাঞ্জন রায়। গ্রাহক নম্বর ১৪১৭, বয়স ১৬ বছর।

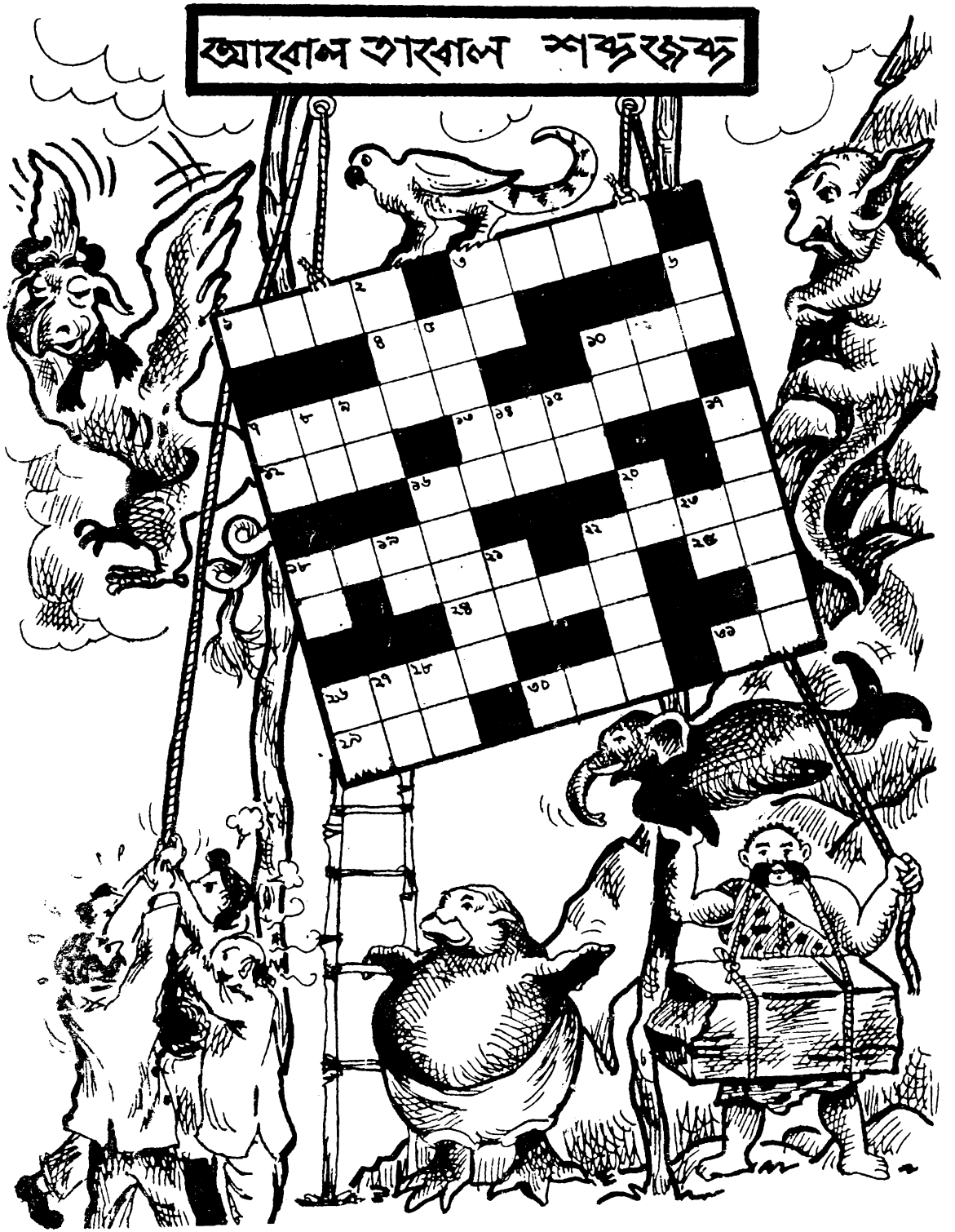

।। সূত্র ।।

পাশাপাশি :

(১) এর খুড়ো আজব কল তৈরী করেন। (৩) আবোল-তাবোলের স্রষ্টা। (৪) সাধারণ গরুর মতো ট্যাঁশগরুর পুষ্টিতে এ পদ্ধতি নেই। (৭) এর ছানার হাসা বারণ। (১০) (উল্টে) দই কি '—' মুড়কি দেওয়া। (১২) হাত '—'। (১৩) ঠোঙাভরা '—'। (১৬) সাপুড়ে। (১৮) রাম '—' পাত্র। (২২) ঐ যে হোথায় '—' থাকে। (২৪) আকাশের গন্ধ। (২৫) '—' কপ্ মাছি ধরে ...। (২৬) আরে, ছি ছি! '—' ...। (২৯) কুমড়োপটাশ '—' পেলে বুঝবে তখন ঠ্যালা। (৩০) কিম্ভূতের লেজটা যে প্রাণীর। (৩১) এই গরু আসলে পাখি।

উপর-নীচ :

(২) হাঁসের সঙ্গে যে জন্তু মিলে হাঁসজারু সৃষ্টি। (৩) কোকিলের মতো তার কণ্ঠেতে '—' চাই। (৫) হেড অফিসের '—'। (৬) গুড়্-গুড়-গুড়্-গুড়িয়ে '—'। (৭) হাঁ হাঁ হাঁ, '—' করো না ...। (৮) দেহের ওজন উনিশটি '—'। (৯) গণেশ নামটির অপভ্রংশ। (১০) (উল্টে) ... তুমিই না হয় করো না '—' চেষ্টা। (১১) (উল্টো) একশো '—' জল ঢালে রোজ ...। (১৪) স্ত্রী। (১৫) কাব্যে 'আমার'। (১৬) লাগ্লো কি '—' ছট্কে এসে ...। (১৭) এর নাচা-কাঁদা, ডাকা, হাসায় অসম্ভব সব কান্ড করতে হয়। (১৮) কি যেন '—' ভুলে গেছি ...। (১৯) (উল্টে) '—' পেওনা ...। (২০) তাই শুনে কেউ '—' ডাকে। (২১) টিকিও ভাল, এটাও ভাল। (২২) অতি খাসা আমাদের '—' মূর্তি। (২৩) বক্ষ। (২৪) খুন হতো '—' চাচা ...। (২৬) সিংহাসনে বসল '—' ...। (২৭) '—' টা আমার বড্ড নরম। (২৮) পরশু '—' পষ্ট চোখে দেখনু ...।

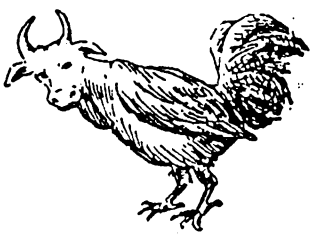

With Best Compliments From :

BAGHUVAR (INDIA) LTD.

"Shantiniketan", 14th Floor,
8, Camac Street,
Calcutta 700 017.

হাট্টিমাটিমটিম

অন্তরীপ সেনগুপ্ত
বয়স ১১ । গ্রাহক নং ১৬৬৪

হাট্টিমাটিমটিম
তারা শিখতে গেল জিম
তাদের বন্ধ হল ডিম
তারা হাট্টিমাটিমটিম।

হাট্টিমাটিমটিম
তাদের ফুরিয়ে গেছে ক্রীম
তারা মাখছে গায়ে হিম
তারা হাট্টিমাটিমটিম।

হাট্টিমাটিমটিম
বাজায় মাদল দ্রিদ্রিমদিম
তাদের ঘুমেতে চোখ ঝিম
তারা হাট্টিমটিমটিম।

বোম্বাগড় সমাচার

রাকা দাশগুপ্ত
গ্রাহক নং ১৩৩৭ । বয়স ১৬

শিব ঠাকুরের দেশ আর তার সেই সর্বনেশে 'একুশে আইন'-এর কথা মনে আছে তো? সেই শিব ঠাকুরের দেশেরই পাশের রাজ্য বোম্বাগড়। বেশ কিছুদিন আগে শিব ঠাকুরের দেশের রাজা বোম্বাগড়ের রাজাকে এক চিঠি পাঠিয়ে সে রাজ্যে যে সব অদ্ভুত কান্ডকারখানা ঘটে, তার কারণগুলি জানতে চেয়েছিলেন। সেই চিঠির উত্তরে বোম্বাগড়ের রাজা যা লিখেছিলেন, তা নিচে তুলে দিলাম।

বোম্বাগড়ের রাজার উত্তর—

শিব ঠাকুরের দেশের অধিপতি,
কুশল জেনে হলাম খুশি অতি।
পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসিলেন যাহা,
এই চিঠিতে লিখছি আমি তাহা।

মিথ্যে নয়কো, বলছি আমি সত্য—
বোম্বাগড়ে দুর্লভ আমসত্ত্ব।
একটা কেবল রাজপ্রাসাদে আছে;
মূল্য সেটার দারুণ সবার কাছে।
সবাই যাতে দেখতে সেটায় পাবে,
বাঁধিয়ে ফ্রেমে ঝুলিয়েছি দরবারে।

আমার রানী ঘুমকাতুরে ভারি,
যেথায় সেথায় ঘুম পেয়ে যায় তারই।
সবখানে কি রেশমী বালিশ থাকে?
তাই সে মাথায় বালিশ বেঁধে রাখে।

মস্ত যোদ্ধা চাইলে হতে ভাই,
কষ্ট সওয়ার শিক্ষা আগে চাই।
তাই বিছানায় শিরীষ কাগজ পাতি
তার ওপরে ঘুমাই সারা রাতি।

ধর্মনিষ্ঠ বড়ই খুড়ো মোর
সোনা-রূপায় বিরাগ তাঁহার ঘোর।
তাই দিয়েছি হুঁকোর মালা গড়ে,
মনের সুখে নাচেন সে হার পরে।

অনেক কথাই লিখলাম উত্তরে,
বাকি সকল জানিয়ে দেব পরে।
নেবেন আমার অনেক শ্রদ্ধা, প্রীতি—
আজ এখানেই করছি তবে ইতি।

আমার চোখে 'আবোল তাবোল'

আত্রেয়ী ভট্টাচার্য্য
গ্রাহক সংখ্যা ২১০৯। বয়স ১২

সুকুমার রায়ের নামকরণ সার্থক। তাঁর রচনায় সৌকুমার্যের পরিচয় আমরা বারেবারেই পেয়ে থাকি। তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ ও সার্থক রচনা আবোল তাবোল, এর কবিতাগুলি যেমনই হাস্যরসে পরিপূর্ণ তেমনই এগুলির মাধ্যমে সমাজের নানা অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। আবোল তাবোলের প্রথম কবিতায় তিনি পাঠককে আহ্বান জানান খেয়ালখুশির জগতে—

'আয় যেখানে ক্ষ্যাপার গানে
নাইকো মানে নাইকো সুর,
আয়রে যেথায় উধাও হাওয়ায়
মন ভেসে যায় কোন সুদূর।'

'খিচুড়ি'-তে কবি দুটি জীবের সংমিশ্রণে সৃষ্ট একটি আজব জীবের কথা বর্ণনা করেছেন, যা হাস্যরসে পরিপূর্ণ। 'গোঁফচুরি'-তে দেখি যে বড়বাবুর মনে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যদি তাঁর গোঁফের সঙ্গে সমাজের নিচুস্তরের কোনো ব্যক্তির গোঁফের কোনোরকম সাদৃশ্য থাকে। তা তাঁর উক্তিতেই স্পষ্ট:

'এমন গোঁফ তো রাখত জানি শ্যামবাবুদের গয়লা?'

'কুমড়োপটাশ' কবিতায় পরোক্ষভাবে লেখক সমাজের কুসংস্কার অর্থাৎ যুক্তিহীন আচার আচরণকে বিদ্রূপ করেছেন। সুকুমার রায়ের 'বুড়ির বাড়ি' আমাদের পুরোনো ভিত্তিহীন সমাজব্যবস্থাকে মনে করিয়ে দেয়, যা সত্যিই

'কাঁটা দিয়ে আঁটা ঘর—আঠা দিয়ে সেঁটে
সুতো দিয়ে বেঁধে রাখে থুতু দিয়ে চেটে।'

'কহ ভাই কহরে', 'কী মুস্কিল!' ও 'বিজ্ঞান শিক্ষা'-য় আমরা এমন সব চরিত্রদের খুঁজে পাই যারা আপাতদৃষ্টিতে শিক্ষিত হলেও প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণই অজ্ঞ। অভিমানী কিম্ভূত কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। এমনকি তার ইচ্ছাপূরণ হলেও সে তার সত্তা বিলোপের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে ওঠে, তখন সে ভাবে—

'মাছ ব্যাং গাছপাতা জলমাটি ঢেউ নই,
নই জুতা, নই ছাতা, আমি তবে কেউ নই!'

অত্যন্ত স্বাভাবিক জিনিসকে অস্বাভাবিক করে দেখা নিয়ে রচিত হয়েছে 'অবাক কান্ড'। অত্যন্ত দুর্বলের উপর কর্তৃত্ব জাহির করাকে তুলে ধরা হয়েছে 'বাবুরাম সাপুড়ে' কবিতায়। ভাষায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই ক্রিয়ার ব্যবহার নিয়ে সুকুমার রায় মজা করেছেন 'শব্দকল্পদ্রুম!' কবিতায়। সেই জগতে:

'খ্যাঁশ্ খ্যাঁশ্ ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্, রাত কাটে ওই রে!
দুড়দাড়, চুরমার—ঘুম ভাঙে কই রে!'

দেশের অরাজকতা ও অবিচারকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন 'একুশে আইন'-এ। তিনি এক নির্ভেজাল হাসির সন্ধান দিয়েছেন 'আহ্লাদী', 'লড়াই ক্ষ্যাপা' এবং 'ঠিকানা' কবিতায়। যারা এক কৃত্রিম গাম্ভীর্যের মুখোশ পরে থাকে তিনি তাদের নিয়ে লিখেছেন, 'রামগরুড়ের ছানা।' 'নেড়া বেলতলায় যায় ক'বার', 'বোম্বাগড়ের রাজা', 'ছায়াবাজী' কবিতাগুলির মাধ্যমে আমরা এক অসম্ভব উদ্ভটের জগতে প্রবেশ করি, সমস্ত ব্যস্ততা বর্জন করে লেখক সহজভাবে জীবনযাপনের পরামর্শ দিয়েছেন 'দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্' কবিতায়। 'হাত গণনা'-য় দেখি খোশমেজাজী নন্দগোঁসাই, থাকে সর্বদাই দেখা যেত 'হুঁকো হাতে হাস্যমুখে', হাত গণনার পর তিনিই

মানসিক রোগী হয়ে পড়েন। বঙ্গসন্তান হয়েও পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণপ্রিয়তাকে বিদ্রূপ করে তিনি রচনা করেছেন 'ট্যাঁশ গরু।'

আবোল তাবোলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা—শেষ কবিতা 'আবোল তাবোল।' মৃত্যুশয্যায় সুকুমার রায় এই কবিতা রচনা করেন। জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এক অপরূপ সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি প্রাণবন্ত গান গেয়ে যাচ্ছেন শেষ বারের মত। সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে তিনি মুক্তির আস্বাদ গ্রহণ করেছেন। শেষ বারের মত তিনি নিজেকে উজাড় করে দিতে চেয়েছেন তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে, সকল বাধাকে উপেক্ষা করে—তা আপাতদৃষ্টিতে যতই অর্থহীন হোক না কেন। তিনি তাঁর ভিতরের এক অন্য সত্তাকে যেন আবিষ্কার করেছেন। এক সৃষ্টির আনন্দ তাঁর মধ্যে দুর্বার হয়ে উঠেছে। সকল অন্ধকার সরে গিয়ে আলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তিনি এই কবিতার মাধ্যমে সুন্দর পৃথিবীকে শেষ বিদায় জানিয়েছেন।

সুকুমার রায় কৌতুকের অবারিত ধারায় বাংলা সাহিত্য প্রবাহকে প্লাবিত করেছেন। তাঁর কবিতার মধ্যে হয়তো লুকোনো ছিল ব্যঙ্গের কশাঘাত, কিন্তু সব সময়েই তা প্রচ্ছন্ন কৌতুকের আবরণে ও পরিমার্জিত আকারে। তাঁর রচনা আবোল তাবোলের মাধ্যমে কৌতুকের রসধারায় অবগাহন করে আমরা বারেবারেই হাস্যরসে স্নাত হই, মনে হয় যেন বইয়ের পাতাগুলোও আমাদের সঙ্গে হাসছে।

সেবার কাজে সবার মাঝে

বি ও সি ইন্ডিয়ার ভ্রাম্যমান চিকিৎসাকেন্দ্র – দূর-দূরান্তে পৌঁছে দিচ্ছে সেবা

কর্মতৎপরতায় অগ্রণী বি ও সি ইন্ডিয়া লিমিটেড ব্যবসায়ী হয়েও আত্মনিয়োগ করেছে সেবাব্রতে।

আমাদের দেশের শতকরা সত্তর ভাগ মানুষ থাকেন গ্রামে। সেখানে আধুনিক চিকিৎসা দুর্লভ। এঁদের সেবায় বি ও সি ইন্ডিয়ার আছে দুটি ভ্রাম্যমান ক্লিনিক। সেবাপরায়ন কিছু চিকিৎসক ও কর্মী আধুনিক চিকিৎসার নানান সাজ-সরঞ্জামে সুসজ্জিত এই ক্লিনিক নিয়ে রোদবৃষ্টি মাথায় করে প্রতিদিনই যান গ্রামবাসীদের কাছে – তাঁদের চিকিৎসার জন্য।

বেশ কয়েক বছর ধরে চলছে এই কাজ। প্রতি বছর দূর-দূরান্তের গ্রামের প্রায় ৬০,০০০ নর-নারী-শিশুর কাছে পৌঁছে যাচ্ছে চিকিৎসার সুযোগ – বিনা খরচে রোগযন্ত্রণা দূর করে তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে।

BOC
বি ও সি ইন্ডিয়া লিমিটেড
বি ও সি গোষ্ঠীর সদস্য

বি ও সি – যে কোম্পানির বিবেক আছে

সুনিশ্চিত নিরাপত্তা ও দ্রুত বৃদ্ধির জন্য

ইউকো ব্যাঙ্কের সুবিধাজনক প্রকল্পগুলিতে সঞ্চয় করুন

ফ্রেন্ড-ইন-নিড সঞ্চয় যোজনা
চেকের সুবিধা সহ একটি ফিক্সড ডিপোজিট যোজনা

লক্ষ্মী যোজনা
ভবিষ্যতের আশা

মানি ব্যাক রেকারিং যোজনা
স্বপ্নকে সফল করে তোলে এই প্রকল্প

লাখপতি যোজনা
লক্ষ টাকা সঞ্চয়ের সহজতম উপায়

মানি মাল্টিপ্লায়ার সঞ্চয় যোজনা
টাকা দ্বিগুণ বা তিনগুণ করার সহজ উপায়

কুবের যোজনা
আপনার সম্পদ বৃদ্ধি করে

ইউকো ব্যাঙ্ক
আপনার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখে

বিশ্বজিৎ রায়

চানা ছাঁকতে ছাঁকতে নিশি পালের দেশের জন্য ভারি মন কেমন করে উঠল। কদ্দিন সে দেশে যায়নি। ওর অজান্তেই মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল বুক থেকে। এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে বেশ খানিকটা কোঁয়া নিল নিশি। এ সময়টা দোকানে কেউ থাকে না। মিষ্টি তৈরির মালমশলাগুলো একা একাই হাতের কাছে গুছিয়ে নেয় সে। তারপর দোকানের জানলা দরজা ভালো করে বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায়। ঘরের মাঝখানে এসে হাত দুটো প্রণামের ভঙ্গিতে তুলে ধরে আর বলে :

বৃষ্টি হয়ে মিষ্টি আয়
ছেলে বুড়ো সবাই খায়
তাক ধিনা ধিন্ ধিনাক তিন্
সবার সুখে কাটুক দিন
সবার মুখ মিষ্টি হোক
থাক সুখে থাক বেবাক লোক।।

ছড়াটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দোকান ঘরের মধ্যে ঝড় হয়ে যায়। কাঁচামালগুলো একে অন্যের সঙ্গে মিশে নাচতে থাকে। নাচতে নাচতে বৃষ্টির ফোঁটার মতো অজস্র মিষ্টি জমে ওঠে ঘরের মধ্যে রাখা পাত্র চারটেয়। মিষ্টির সে কী রং। বৃষ্টির নতুন ফোঁটার মতো ঝক্‌ঝকে। ঝড় থামলে পরম তৃপ্তি নিয়ে চোখ খোলে নিশি পাল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় মিষ্টির দিকে। চারটে পাত্রের গায়ে এঁটে দেয় চারটে লেবেল—ভূতাতুয়া, কাদাতুয়া, সাদাতুয়া আর লালাতুয়া। লেবেল চারটে পুরনো হওয়ার জো নেই। কোনো কিছু পুরনো হলেই এ মিষ্টির স্বাদ কমে যাবে, আর তাজা থাকবে না।

সবচেয়ে চাহিদা কাদাস্তুয়ার। সবাই কাদাস্তুয়া খেতে চায়। নিশি যোগান দিয়ে উঠতে পারে না। কাস্টমারদের বিনীত ভাবে বলে, 'আজকে খাওয়াতে পারলাম না। কালকে আপনার জন্য ঠিক রেখে দেব।' খাওয়াতে না পারার দুঃখে মনটা উদাস হয়ে যায়। সামান্যই তো মিষ্টি, অথচ বেশি করে যে বানাবে তার উপায় নেই। কাদাস্তুয়া বানানোর বিশেষ মশলা রোজ বরাদ্দ থাকে, তার থেকে বেশি চাইলে পাওয়া যাবে না। অবশ্য এটাও যে পাওয়া যাচ্ছে এই ঢের।

এই নিয়েই তো ঝগড়া লেগেছিল রাজার সঙ্গে। রাজা সমস্ত কাদাস্তুয়া নিয়ে যেতে চায় রাজবাড়িতে। আর কাউকে সে কাদাস্তুয়া দেবে না। রাজ্যময় নিয়ম জারি করল জনসাধারণের কাদাস্তুয়া খাওয়া নিষেধ। এ মিষ্টি শুধু রাজা খাবে, আর খাবে দেশে-বিদেশে রাজার বন্ধুরা। নিশি এ'কথা মানতে নারাজ। তা হয় নাকি! যে লোকটা সদ্য মরে ভূতের দেশে এল সে লোকটার মনটা তো ভেজা পাতার মতো নেতিয়ে থাকে। বাড়ির জন্য, ছেলেপুলের জন্য তখন তার মনে বেজায় দুঃখ। তার মন ভালো করার জন্য কাদাস্তুয়া চাই। পৃথিবীতে যে ছেলেটা একাই থাকে, যার মা'ও নেই বাবাও নেই, তাকেও তো কাদাস্তুয়া দিতে হয়। যখন সে ঘুমে ঢুলে পড়ে তখন আলতো করে তার ঠোঁটে কাদাস্তুয়া গুঁজে দেয় নিশি। ঘুমের ঘোরেই মুখ চলে। সকালে যখন তার ঘুম ভাঙে তখন দুঃখ-টুঃখ সব হাওয়া। সেই কাদাস্তুয়া শুধু রাজাকে দিলে হবে!

রাজাও ছাড়বে না, নিশিও দেবে না। এ নিয়ে বেশ কয়েক দিন ঝগড়া চলল। সাধারণ ভূতেরা সবাই নিশির দলে। কিন্তু হলে কি হবে পাইক বরকন্দাজ সবাই রাজার চাকর-বাকর। রাজার আদেশে তারা নিশিকে দেশ ছাড়া করল। রাজা চোখ পাকিয়ে বলল, 'দেখি এবার তুমি কাদাস্তুয়া বানাও কেমন করে!'

কাদাস্তুয়া হ'ল বিশেষ রকমের পান্তুয়া। ছানার সঙ্গে কাদা মিশিয়ে তৈরি। এ'কাদা অবশ্য যেমন-তেমন কাদা হলে চলবে না। ভূতের দেশের সাদা কাদা হওয়া চাই। সেখানকার কাদার মতো চমৎকার সরেস কাদা আর হয় না। ধুলোময়লার বালাই নেই। সে কাদায় এখনও পাপ মেশেনি। নিশিকে রাজা দেশ থেকে ভাগিয়ে দিলে অন্য দেশে এই কাদা সে পাবে কোথায়!

উপায় অবশ্য একটা হ'ল। ভূতের দেশের সাধারণ ভূতেরা নিশিকে জানিয়ে দিল, 'তোমাকে আমরা কাদা পাঠাব।'

নিশি বলল, 'সে না হয় পাঠাবে, কিন্তু এখন আমি যাব কোথায়?'

প্রশ্ন শুনে ভূতেরা এ ওর দিকে তাকায় আর মাথা চুলকোয়।

শেষে কনিষ্ঠ ভূত বলল, 'এক কাজ কর, তুমি আমার বাড়ি চলে যাও।'

কনিষ্ঠ ভূত ভূতলোকে এসেছে সবে কয়েকদিন। পৃথিবীতে তার মিষ্টির দোকান। ভূতলোকে এসে মিষ্টির দোকানের শোকে সে যখন মর মর তখন নিশি তাকে কাদাস্তুয়া খাইয়েছিল। মাথায় পায়ে হাত বুলিয়ে বলেছিল, 'দুঃখ কোরো না ভাই। সবই অদৃষ্ট। হবার যেটা সেটাই হবে। অদৃষ্টকে বেশি পাত্তা না দিয়ে তাই সুখে থাকাই ভালো।' নিশির কথায় আর কাদাস্তুয়ার স্বাদে কনিষ্ঠের মনটা তখন ফুরফুরে সমুদ্রের বাতাস।

কনিষ্ঠ বলল, 'আমার বাড়িটা এখন খালিই আছে। শ্রাদ্ধ শান্তি হয় নি বলে পাড়ার ছেলেরা ঘর-দোকানের দখল নেয়নি। তুমি গিয়ে বরং সেখানেই থাকো। কেউ কিছু বলতে এলে বলবে তুমি পরেশনাথের গ্রামতুতো ভাই। পরেশনাথের তিনকুলে কেউ নেই বলে তুমি-ই এ বাড়ির মালিক। তাও যদি না শোনে তবে ঘরের দক্ষিণ কোণের মাটি খুঁড়ে দলিল বের কোরো। দলিল নিয়ে ভজ উকিলের কাছে গেলে সাহায্য পাবে।'

কনিষ্ঠের কথাই স্থির হ'ল।

পৃথিবীতে এসে নিশি আশ্রয় নিল কনিষ্ঠের দোকান ঘরে।

পাড়ার ছেলেরা প্রথমে একটু কিন্তু কিন্তু করেছিল বটে, পরে আর কিছু বলেনি। বিশেষ করে যে দোকানে চার রকমের পান্তুয়া হয় সে দোকান তো পাড়ার গর্ব!

ভূতেরা আসত মধ্যরাতে। কাদাস্তুয়ার জন্য শুদ্ধ কাদা দিয়ে যেত। তবে অনেক কাদা তো একসঙ্গে পাচার করা যায় না। তাতে রাজার সন্দেহ হয়। কাদার পুঁটলিটা নামাতে নামাতে কনিষ্ঠ বলত, 'নিশিদা দেশের অবস্থা ভালো নয়। রাজাটা দিন দিন খামখেয়ালী হয়ে উঠছে।'

নিশি উদাস স্বরে জিগ্যেস করে, 'আমি দেশে ফিরতে

পারব না?'

'আর কিছুদিন এখানে থাকো নিশিদা। রাজা বদলালে যেও তখন।'

কিছুদিন মানে আর ক'দ্দিন? নিশি হাঁপিয়ে ওঠে। গলির মুখে দোকান। গলি ডিঙোলেই বড় রাস্তা। সারাদিন বাস, ট্রামের শব্দ। ধুলো, ধোঁয়ায় ভরপুর। সবুজের ছিটে-ফোঁটা নেই। থেকে থেকে নিশির মন খারাপ হয়। ছানা ছাঁকতে ছাঁকতে আজকেও তার মনটা গেল খারাপ হয়ে।

মন খারাপ হলে অবশ্য চলবে না। এই মিষ্টির দোকান ছেড়ে সে যাবে কোথায়? তাছাড়া দোকানের এখন বেজায় নাম-ডাক। সাতপাড়ার লোক এর খবর রাখে। রোগীরাও তার পান্তুয়া খায়। গোবে ডাক্তার রোগীর পথ্য লেখে :

R/

সকালে চারটে কাদান্তুয়া,

রাতে চারটে ভূতান্তুয়া (কাদান্তুয়া না পাওয়া গেলে)

শরিকদের মধ্যে ঝগড়া হলে কাদান্তুয়ার খোঁজ পড়ে। কাদান্তুয়া খেলে মন ভালো হয়, আর সমস্যা থাকে না। পাড়ার ঝগড়াটে বুড়ি একবার কাদান্তুয়া খেয়েছিল। সে আর গাল পাড়ে না। লোকের সঙ্গে ঝগড়া হলে বুড়ি এখন গান ধরে, 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হ'ল পার কর আমারে'। এদের ফেলে কি নিশি হঠাৎ যেতে পারে!

তা বলে অবশ্য নিশির শত্রুর অভাব নেই। তার শত্রু হ'ল অন্য মিষ্টির দোকানের মালিকেরা। 'আদি সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভান্ডার'-এর মালিক তাকে দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। 'আবার খাবো'র মালিক তার নামে যা ইচ্ছে তাই বলে। 'মুখরোচক'-এর মালিকেরা তার কুশপুতুল পুড়িয়েছিল। দেখে নিশির সে কি হাসি।

নিশিকে হাসতে দেখে বেজায় চটেছিল আপ্পু। খানিকটা অভিমান আর রাগ মিশিয়ে তেজী গলায় বলেছিল, 'নিশিকাকা তুমি হাসছ? ওরা যা ইচ্ছে তাই করবে আর তুমি হাসবে?'

না, ছেলেটা নিশিকে সত্যিই ভালোবাসে। স্কুল থেকে টিফিনে লুকিয়ে চলে আসে তার দোকানে। এসে বলে, 'নিশিকাকা আচার এনেছি।' এক টাকার সদ্য টক্ আচার দু'জনে পা ঝুলিয়ে খায়। মুখ দিয়ে টক্‌টক্ করে শব্দ করে। টিফিন তো মাত্র কুড়ি মিনিট, কিন্তু ওই সময়েই দু'জনে রাজ্যির গল্প।

নিশি টক্ তেঁতুল চুষতে চুষতে ভাবে ভাগ্যিস পৃথিবীতে এসেছিল। না হলে কি আপ্পুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হোত! টক্ আচার খেতে পেত! ভূতের দেশে তো আর টক্ আচার পাওয়া যায় না। তাছাড়া সেখানে তারা সব সময় মানুষের বেশে থাকে না কি! জলবাতাসের সঙ্গে মিশে থাকে। খাওয়ার সময় শুধু টপ্ করে মানুষ হয়ে যায়।

আপ্পুকে নিশি বলেছিল, 'হাসবই তো। ওরা পুতুল পোড়ালে আমার কী?'

'তা বলে জ্যান্ত মানুষের পুতুল পোড়াবে?'

'আমি তো জ্যান্ত নই।'

'জ্যান্ত নও মানে?'

'আমি ভূত', বলে আপ্পুর মাথার চুল ঘেঁটে দিয়েছিল নিশি।

সরল কাচের মতো চোখ তুলে নিশিকে একবার মেপে নিল আপ্পু। তারপর ফিক্ করে হেসে বলল, 'নিশিদা ঢপ্ দিচ্ছ?'

ঢপ্ মানে গুল। এ'কথাটা এখন বেজায় চালু হয়েছে।

'না গো ঢপ্ নয়, আমি সত্যি ভূত।'

নিশি যত বলে আমি সত্যি ভূত আপ্পু তত হাসতে থাকে। শেষে হাসতে হাসতে হেঁচকি উঠল, পেটে ব্যথা হয়ে গেল।

নিশি আর কি করে! ছোট ছেলের কাছে বেইজ্জত হওয়ার ভয়ে গোটা গল্প বলতে হ'ল। একদিন সকালে ডেকে দেখাতে হল মিষ্টি তৈরির পদ্ধতি।

ব্যাপার দেখে তো আপ্পু থ। বলল, 'কেন বল থাক সুখে থাকবে বেবাক লোক? অন্য মিষ্টির দোকানের লোকেরা তোমাকে দেখতে পারে না। তোমার সঙ্গে শত্রুতা করে।'

তা অবশ্য করে। এক দিন সকালে নিশি সবে দোকান খুলেছে। এমন সময় একটা লোক এসে হাজির। লোকটা লম্বাও নয় বেঁটেও নয়, মোটাও নয় রোগাও নয়, সাদাও নয় কালোও নয়। লোকটা যে ঠিক কেমন এক কথায় তা বলা যায় না। নিশিকে দেখেই সে টিপ্ করে প্রণাম করল। বলল, 'আমার তিনকুলে কেউ নেই। আমি বড় গরীব কত্তা, আমাকে থাকবার ঠাঁই দিন।' লোকটার কথায় নিশির মন গলে জল। থাকতে প্রায় দিয়ে ফেলে, নিজের হাতে এগিয়ে দেয় কাদান্তুয়া।

ওমা, কাদান্তুয়া খেয়ে লোকটার হাউ-হাউ করে সে কী কান্না। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি লোক ভালো নই। আমি আপনার সর্বনাশ করতে এসে ছিলাম। 'মুখরোচক'-এর মালিক আমাকে পাঠিয়েছে আপনার মিষ্টিতে বিষ মিশিয়ে দিতে।' বলেই লোকটা এক ছুটে উধাও।

আপ্পু পরে বলেছিল ওর নাম বর্ণচোরা। বেজায় মস্তান কিন্তু দেখে বোঝার উপায় নেই। বর্ণচোরা অবশ্য কাদান্তুয়া খেয়ে ভালো হয়ে গেছে। এখন মাঝে মাঝে দোকানে আসে, উদাস হয়ে বসে থাকে দাওয়ায়।

আপ্পুর রাগ রাগ মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভূতের সঙ্গে আবার শত্রুতা কী? তাছাড়া কাদান্তুয়া খেলে তো সবার মন ভালো হয়, তাই মন্ত্রটা এমনতর। আর দেখছ না মিষ্টিগুলো কেমন বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটার মতো এস জমে—শত্রুতার কথা ভাবলে কী আর এমন ভালো বৃষ্টি হয়!'

নিশিকাকার কথাটা অবশ্য আপ্পুর তেমন পছন্দ হয়নি। বাজে লোকদের মোটেই সুখে থাকা উচিত নয়।

এসব ভাবতে ভাবতেই নিশি আজ কাদান্তুয়া বানিয়ে ফেলল। আজ ভজ-উকিলের মেয়ের বিয়ে। বিয়েবাড়িতে নিশি মিষ্টি সাপ্লাই করে না। তবে ভজ-উকিলের কথা আলাদা। কনিষ্ঠ তাকে ভজ-উকিলের কথা বিশেষ করে বলে দিয়েছে। তাছাড়া উকিলবাবু নিজে এসেছিলেন তার দোকানে। বলেছেন, 'বাবা, পরেশনাথের দোকানের মিষ্টি আমি নিয়ম করে খেতাম। পরেশনাথ তো আর নেই। তাই তুমি যদি বরযাত্রীদের জন্য দু'শোখানা মতো কাদান্তুয়া দাও...'

ভজ-উকিলকে ফেরায়নি নিশি। বলে দিয়েছে উকিলবাবুর বাড়িতে নিজের হাতে সে কাদান্তুয়া দিয়ে আসবে।

দু'শোখানা কাদান্তুয়া নিশি আলাদা করে রাখল। আপ্পু স্কুল ছুটির পর এখানে আসবে। তারপর দু'জনে মিলে উকিলবাবুর বাড়ি যাবে।

মাঝে মাঝে নিশির মনে হয় অন্য লোকদের কাদান্তুয়া করতে শিখিয়ে দেবে। একবার ভেবেও ছিল সোজা যাবে 'মুখরোচক'-এর দোকানে। বলবে এলুম। তারপর জানিয়ে দেবে কাদান্তুয়া বানানোর কায়দা। মানুষজন অবশ্য ছড়া বলে মালমশলাগুলোকে নাচের তালে মেশাতে পারবে না। কড়াতে পাক করতে হবে।

নিষেধ করল কনিষ্ঠ। বলল, 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নিশিদা। নইলে অসৎ লোকদের কাদান্তুয়া বানানো শেখাতে চাও!'

আজ সকাল থেকেই দোকানে বড্ড ভিড়। বিকেলে দোকান বন্ধ করে সে যে ভজ-উকিলের বাড়ি যাবে তা সবাই জেনে গেছে। কেউ কেউ এসে বলছে, 'আমার ভায়ের বিয়েতে কাদান্তুয়া দিতে হবে কিন্তু।' বিনীত হাসি হাসছে নিশি। মুখে কিছু বলেছে না। না, উৎসব বাড়ির অর্ডার সে নেবে না। নিলে অন্য মিষ্টির দোকানগুলো পথে বসবে।

সারাদিনের ধকলে ক্লান্ত নিশি দুপুর বেলায় ঝাঁপ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙলো বিকেল সন্ধ্যের মুখে। আপ্পু কড়া নাড়ছে।

'নিশিকাকা ও নিশিকাকা।'

লুঙ্গিটা সামলাতে সামলাতে দরজাটা খুলে দিল।

'কী ঘুমোচ্ছিলে গো। কখন থেকে ডাকছি। সন্ধ্যে হতে চলল। তাড়াতাড়ি লগ্ন। বরযাত্রীরা এসে যাবে না।'

'এ বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। চল চল।' নিশি চোখ মুছে ঘুম তাড়াতে তাড়াতে বলল।

লুঙ্গির ওপর একটা ফর্সা পাঞ্জাবী চাপিয়ে নিল নিশি। মিষ্টির পাত্রটা দু'হাত দিয়ে মাথায় তুলল। মোটে তো দু'শোটা মিষ্টি।

ভজ-উকিলের বাড়িটা পাড়ার একটু ভেতরে, মস্ত মাঠের ওপর। আপ্পুকে নিয়ে কথা বলতে বলতে রওনা দিল নিশি। তখন সন্ধ্যে হয় হয়।

'নিশিকাকা, তোমার দেশের খবর কী?'

'খবর ভালো নয়। এখনও রাজা বদল হ'ল না।'

'তোমার বুঝি দেশের জন্য মন কেমন করে?'

'তা একটু একটু করে বৈকি।'

'এখানে থাকতে একটুও ভালো লাগে না?'

'লাগে, তুমি আছ বলে ভালো লাগে।'

'তাহলে সবাইকে যে হাসি মুখে কাদান্তুয়া খাওয়াও! সবাই সুখে থাক বলে মন্ত্র পড়!'

কথা বলতে বলতে ওরা অনেকটা পথ চলে এসেছিল। গলির এখানটা একটু অন্ধকার মতো। হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে উঠে এল চারজন লোক। এদের একজনকে আপ্পুরা চেনে

—'মুখরোচক'-এর মালিক। অন্য তিনজনের চেহারা দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না তারা ভাড়াটে মস্তান। দু'জনের হাতে রড, একজনের হাতে চেন।

'পাকড়ো উস্‌কো।' 'মুখরোচক'-এর মালিক চেঁচিয়ে ওঠে।' বিয়েবাড়িতে মিষ্টি সাপ্লাই দেবে। মেরে লাশ করে দেব না।'

মস্তান তিনজন পজিশন নেয়।

'আপ্পু পালা' নিশিকাকা চীৎকার করে ওঠে। 'আমার সঙ্গে ওরা তাল রাখতে পারবে না।'

'মুখরোচক'-এর পেটমোটা মালিককে ধাক্কা মেরে আপ্পু ছুট দেয়। না, নিশিকাকার জন্য চিন্তা করছে না সে কিন্তু লড়াইয়ের ফাঁকে কাদাস্তুয়াগুলো নষ্ট হয়ে যাবে না তো। একটানে অনেকটা দম বুকে নেয় আপ্পু। তারপর ছুট ছুট। ঠিক যেন হাওয়া কেটে ছুটছে যুদ্ধ বিমান। সোজা থামে ভজ-উকিলের বাড়িতে।

সমীরণদা অতিথিদের আপ্যায়ন করছিল। দম ফেলতে ফেলতে তাকে ঘটনাটা জানাতেই জগাদা, নৃপেনদা, বিষ্ণুদা তৈরি হয়ে নেয়। আপ্পুর সঙ্গে আবার ছুট লাগায় গলির দিকে।

গলির মধ্যে ঝড়ো বাতাস। এই বাতাসটাকে আপ্পু চেনে। বুঝতে অসুবিধে হয় না তার নিশিকাকার ভুতুড়ে বাতাসের ঘায়ে গুন্ডাগুলো কী পরিমাণ নাকাল হচ্ছে। রড আর চেন খড়কুটোর মতো পাশের নালিতে উড়ে এসে পড়ে। আর খানিকটা এগোতেই নিশিকাকার দেখা পাওয়া গেল। তিন গুন্ডা আর 'মুখরোচক'-এর মালিক লাউ-এর মতো শুয়ে আছে মাটিতে। অবিশ্বাসের ঘোর ওদের চোখেমুখে।

আপ্পুদের দল হইহই করে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। নৃপেনদারা মালিক আর গুন্ডাগুলোকে মাটি থেকে তুলে গলা ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে যায় থানার দিকে। বিষ্ণুদা নিশিকাকাকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে ওঠে 'খেল্ দেখালেন দাদা। একা তিন গুন্ডাকে মালিশ করে দিলেন।'

'যা বলেছিস। মিষ্টি নয়, মুষ্টিতেও দাদা ওস্তাদ।' নৃপেণদা ফুট কাটে। কিন্তু নিশিকাকার বিষণ্ণ মুখটা আপ্পুর চোখ এড়ায় না। ভজ-উকিলের বাড়ির দিকে আস্তে আস্তে এগোয় ওরা। কাদাস্তুয়ার সামনে অল্প হেলে পড়া পাত্রটাকে হাত দিয়ে মাথায় ঠিক করে নেয় নিশি।

আপ্পু জিগ্যেস করে, 'তোমার কিছু হয়নি তো নিশিকাকা।'

'হয়নি। তবে এ দেশে আর থাকা চলবে না।' একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিশি। 'হাওয়া চালিয়ে যখন ওদের শায়েস্তা করছিলুম তখন ওরা টের পেয়েছে আমি সাধারণ মানুষ নই। কথাটা ছড়াবে। লোকে আর আমায় বিশ্বাস করবে না।'

'তাহলে?' আপু জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকায়।

'এদেশ ছেড়ে চলে যাব। অন্য কোথাও, অন্য কোনও-খানে।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই বিয়েবাড়ির ঝক্‌ঝকে আলো আর সানাইয়ের শব্দ এড়িয়ে চুপিচুপি এক ফাঁকে বাড়িতে ঢুকে পড়ে নিশিকাকা। কাদাস্তুয়ার পাত্রটা সবার অজান্তেই খাবার জায়গায় রেখে বাইরে আসে। বড় বড় পায়ে ডিঙিয়ে যায় বিয়েবাড়ির মাঠ।

'নিশিকাকা নিশিকাকা,' বলে ডাকতে ডাকতে আপ্পু পেছু নেয়। গলিতে ওঠে। কিন্তু নিশিকাকা যেন হাওয়ায় মিশে গেল। ছল্ ছল্ করে ওঠে আপ্পুর চোখ। আর কোনও দিন নিশিকাকা আসবে না, কাদাস্তুয়া খাওয়াবে না। আচ্ছা লোকে অন্য চোখে দেখবে বলেই কি নিশিকাকা চলে গেল, নাকি সবাইকে সুখে থাকার মন্ত্র অভিমানী নিশিকাকা আর বলতে পারবে না বলে হাওয়ায় মিশে গেল। আপ্পুর ভাবনা শেষ হতে না হতে আকাশ থেকে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। এই বৃষ্টির বর্ণগন্ধ আপ্পুর চেনা।

ছবি : দেবাশীষ দেব

সত্যজিৎ রায়
হীরক রাজার দেশে

হীরকরাজ্যের দুই পেয়াদা উদয়নের খোঁজে গুহার দিকে এগিয়ে আসে।

এদিকে গুহার ভিতর উদয়ন, গুপী, বাঘা ঘাপটি মেরে, দম বন্ধ করে লুকিয়ে।

পেয়াদারা গুহার বাইরে চারিপাশ দেখে চলে যায়।

খানিক পরে বাঘা অতি সন্তর্পণে গুহা থেকে বেরিয়ে দেখে, পেয়াদারা টিলার পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাঘা (হাঁফ ছেড়ে) : চলে গেছে!

উদয়ন আর গুপী গুহা থেকে বেরিয়ে আসে। উদয়ন কিছুটা নিশ্চিন্ত।

উদয়ন : যাক্। আর আসবে না। এখন কিছুদিন এখানে থাকা যাবে।

গুপী : তুমি দেশে ফিরবে না?

উদয়ন : ফিরব। ফিরতেই হবে। এই ভূত যদ্দিন আছে তদ্দিন আমার শান্তি নেই। এর একটা বিহিত করতে হবে। একটা পোশাক পেলেই ফিরব।

গুপী একবার আড়চোখে বাঘাকে দেখে, তারপর উদয়নকে—

গুপী : হেঃ! পোশাক ত চাইলেই পাওয়া যায়!

উদয়ন : না না। যেমন তেমন পোশাক নয়। একটা বিশেষ ধরণের পোশাক।

গুপী আবার বাঘার দিকে দেখে।

গুপী : বলব?

বাঘা অনুমতি দেয়। অর্থাৎ, ভূতের রাজার বরের ব্যাপারটা উদয়নকে বলা যেতে পারে।

বাঘা : বল, ক্ষতি নাই।

গুপী (উদয়নকে): তুমি কাউরে কয়ে দেবে না ত?

উদয়ন (অবাক) : কী?

গুপী : আমরা না, জাদু জানি!

বাঘা : আমরা যখন যা পোশাক চাই, তাই পাই!

গুপী : যা খেতে চাই, তাই পাই!

বাঘা এবার উদয়নকে তাদের পায়ের জাদু জুতোগুলো দেখায়।

বাঘা : আর এই জুতা পায়ে না, আমরা যেখানে ইচ্ছা চাই যেতে পারি! হ্যাঁ! নিমেষের মধ্যে!

গুপী : আর আমরা যখন গান গাই, তখন কেউ নড়তে চড়তে পারে না!

উদয়ন এখনো অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দু'জনের জাদু জুতো দেখছে। গুপী-বাঘা আর লোভ সামলাতে পারে না।

গুপী : দেখবে? এর মজা দেখবে?

বাঘা : দেখবে, অ্যাঁ? আচ্ছা দেখ—

পাহাড়ের নিচের দিকে বেশ কিছুটা দূরে একটা বড় পাথরের খণ্ড রয়েছে। সেইটার দিকে দেখায় বাঘা।

বাঘা : আমরা ওই পাথরের উপর চলে যাব! দেখ—

উদয়ন ঘুরে পাথরটা দেখে। আর পাশ থেকে গুপী-বাঘা হাততালি দিয়ে —

গুপী-বাঘা : পাথরের উপর!

চোখের পলকে ম্যাজিকের মতো দু'জন আবির্ভূত হয় দূরে সেই পাথরটির উপর।
উদয়ন স্তম্ভিত। সে বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ায়।
বাঘা এবার উদয়নকে পাহাড়ের নিচের পুকুরটা দেখায়।

বাঘা : এবার পুকুরের ধারে!

গুপী-বাঘা আবার হাততালি দেয়।

গুপী-বাঘা : পুকুরের ধারে!

পাথরের উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় দু'জনে। তারপর ক্যামেরা ডাইনে ঘুরলে দেখা যায় তারা দূরে পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে আছে।

বাঘা : এই যে, এখানে!

বাঘার হাঁকে উদয়ন পুকুর ধারে তাকায়। আরো অবাক। সে যেন ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না।

বাঘা (চেঁচিয়ে) **:** এবার তোমার কাছে যাব!

আবার হাততালি।

গুপী-বাঘা : গুহার সামনে!

দু'জনে পুকুর ধার থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বাঘা : হ্যাঃ!

নেপথ্যে বাঘার এই হাসি শুনে উদয়ন পিছন ফিরে দেখে গুপী-বাঘা গুহার সামনে এসে হাজির!

বাঘা (উদয়নকে): কী খাবে বল! আমরা তোমার খাবার আনি?

উদয়নের একটা ফন্দি মাথায় এসে গেছে।

উদয়ন : সেটা পরে হবে। আগে বল তোমরা আমার দলে কিনা। তোমাদের জাদু আমার কাজে লাগবে।

বাঘা : আমরা ভালোর দলে।

গুপী : হ্যাঁ, ভালোর দলে। হেঃ—হাল্লা মন্ত্রীর ষড়যন্ত্র ত আমরাই ফাঁস করে দিয়েছিলাম!

বাঘা : হ্যাঁঃ! আমরা তোমার ভালো চাই।

গুপী : হ্যাঁ—!

উদয়ন : আমার ভালোটা বড় কথা নয়। দেশের ভালো, দশের ভালো।

গুপী : আমরা তাই চাই!

উদয়ন দু'জনের সামনে এসে দাঁড়ায়।

উদয়ন : তাহলে শোনো। তোমরা যাবে, রাজার অতিথি হয়ে। এ সুযোগ খুব বড় সুযোগ। তোমরা খাতির পাবে খুব। তাতে খুশির ভান করবে। রাজাও তাতে খুশি হবে। তোমরা হীরার খনিটা দেখতে চাইবে।

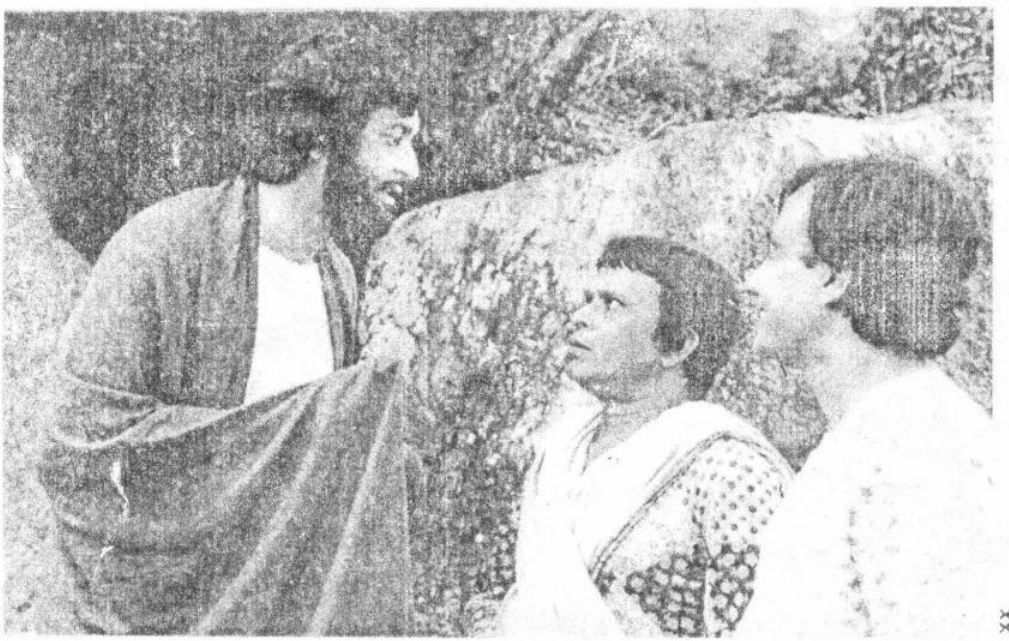

গুপী : কেন?

বাঘা : হীরার খনি কেন?

উদয়ন : কারণ আছে। পরে বুঝবে। এমনি দেখাবে না, দেখতে চাইলে দেখাবে। মনে থাকবে ত?

গুপী : হ্যাঁ— থাকবে।

বাঘা : থাকবে!

উদয়ন তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

উদয়ন : তাহলে হাত মেলাও!

গুপী-বাঘা পরস্পরের দিকে দেখে। তারপর উদয়নের দিকে তাকিয়ে তাদের ডান হাত বাড়ায়, মুখে হাসি।

তিনজনের হাত একত্র হয়।

।। ৬ ।।

হীরকরাজ্য।

রক্ষামন্ত্রী ও বার্তামন্ত্রী চারজন পেয়াদাকে নিয়ে উৎসবের কাজ পরিদর্শন করতে বেরিয়েছেন।

উদয়নের ছাত্ররা রাস্তার ধারের এক খাদের মধ্যে থেকে সেই দৃশ্য দেখে। একটি ছাত্র খাদের বাইরে বসে ঢোলক বাজাচ্ছে।

মন্ত্রীরা ছেলেদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়।

সুগত খাদের ভেতর থেকে উঁকি মারে, হাতে গুলতি। সে রক্ষামন্ত্রীর দিকে তাক করে গুলতি ছোঁড়ে। পাথর লেগে রক্ষামন্ত্রীর মাথা থেকে পাগড়ি ছিট্‌কে বেরিয়ে যায়।

মন্ত্রী চম্‌কে উঠে পিছনে তাকান। কিন্তু ঢোলক বাদক ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পান না, কারণ সকলেই ইতিমধ্যে খাদের ভিতর লুকিয়ে পড়েছে।

একটি পেয়াদা মন্ত্রীর পাগড়ি উদ্ধার করে এনে তাঁকে দেয়। তিনি বিরক্তভাবে সেটা মাথায় চাপিয়ে রওনা হন।

রাজপেয়াদার দল রাজপথের ধারে গরীবদের বস্তির উপর হামলা করে। দামামাধ্বনির সঙ্গে সকলকে তাদের ঘর থেকে বল্লমের খোঁচা মেরে বার ক'রে, কানাতে ঘেরা একটি জায়গায় নিয়ে গিয়ে পুরে দেয়। তিন মিনিটের মধ্যে সমস্ত জ্বলেপুড়ে দারিদ্র্যের সব চিহ্ন উবে যায়।

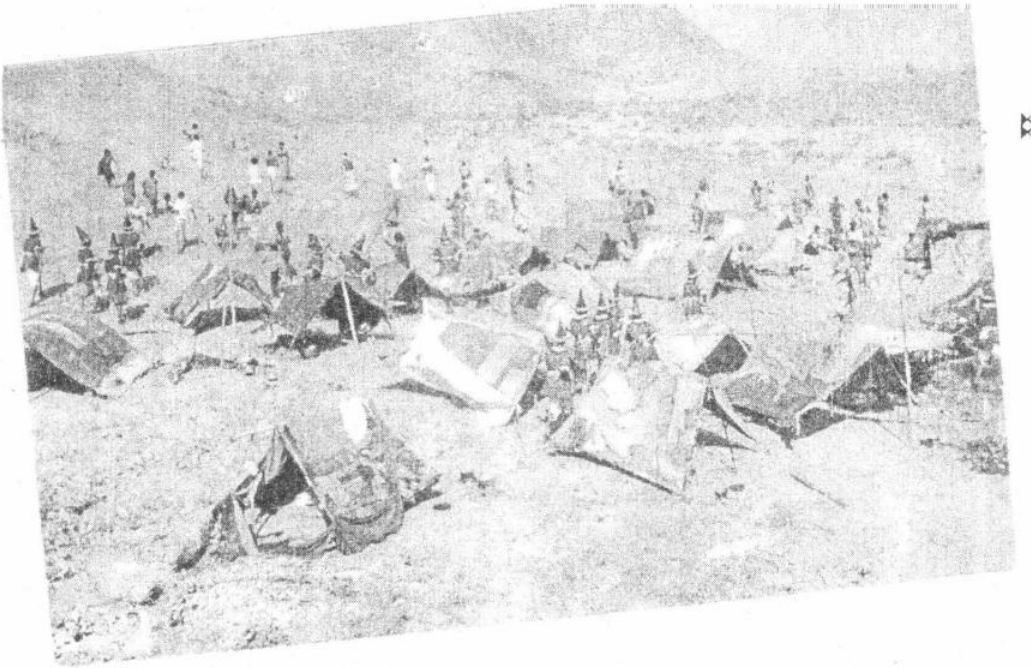

হীরকরাজার মন্ত্রণাকক্ষ।
রাজা মহা আক্রোশে পর পর পাঁচজন মন্ত্রীর গলা থেকে হীরার হার টেনে খুলে নেন।

রাজা: অর্বাচীন! ভূত! আহাম্মক! উজবক! অকর্মার ঢেঁকী! উঁঃ —
হীরা ঝুলায়েছে গলে! —আর যত গাফিলতি তলে তলে!!

মন্ত্রীরা ক্ষীণ প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু রাজা তাদের ধমকে থামিয়ে দেন।

রাজা : না! আমি আর কোনো কথা শুনব না! উদয়ন পণ্ডিতরে ধরে আনা চাই! নইলে কী বুঝে নাও—

মোসাহেব তার জায়গা থেকে টিপ্পনী কাটে।

মোসাহেব : মগজ ধোলাই!

রাজা রাগে গজ্ গজ্ করতে করতে সিংহাসনের দিকে এগিয়ে যান।

রাজা : এক মাস হল পালায়েছে সে লোক —একশ' পেয়াদা খোঁজে তারে, একশ' জোড়া চোখ—তবু পায় না কেন? এটা কী?
মোসাহেব : ফাঁকি, ফাঁকি! কাজে ফাঁকি!
রাজা : সব ব্যাটা ঠক্!

রাজা এবার বৈজ্ঞানিককে দেখেন। সে ঘরের একদিকে চিন্তিত হয়ে পায়চারি করছে।

রাজা : দূরবীন কী হল, গবেষক?

রাজার প্রশ্নে বৈজ্ঞানিক ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

বৈজ্ঞানিক : রাখা আছে মহারাজ , জানালায়!

রাজা : তাতে কিছু দেখা যায়? মানে কিছু আছে?

বৈজ্ঞানিক : অদ্ভুত শক্তি আতস কাঁচে! যোজন দূরের বস্তু চলে আসে দুই হাত কাছে!

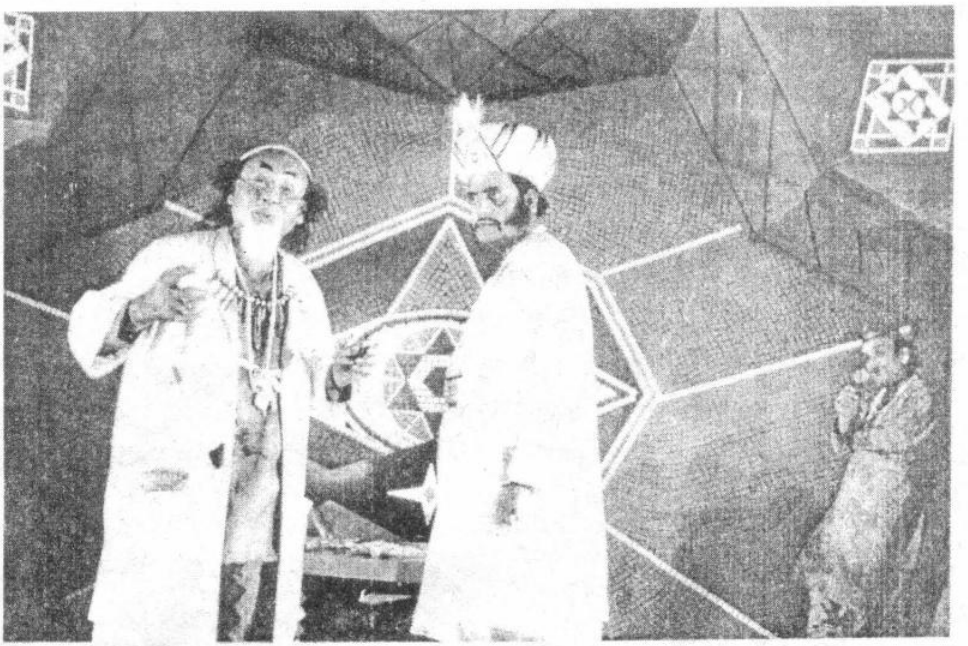

রাজা : বেশ। তাতে চোখ রেখে বসে থাক সর্বক্ষণ। এইটেই তোমার একমাত্র কাজ এখন। যাও ঘরে—

বৈজ্ঞানিক রাজাকে কুর্নিশ করে প্রস্থান করে।
রাজা এবার অন্য সকলকে উদ্দেশ্য ক'রে বলেন—

রাজা : মনে রেখ—উদয়ন পণ্ডিত—হীরকের সবচেয়ে বড় শত্রু সে! এতদিন রাগ পুষে, হঠাৎ যদি উৎসবের আগে সে কিছু করে বসে—

মোসাহেব : সব যাবে ধসে!

রক্ষামন্ত্রী রাজাকে সান্ত্বনা দেন—

শিক্ষা : তার লোকবল নেই মহারাজ — সে ত একা!

মন্ত্রীরা : একা!

মোসাহেব : ন্যাকা!

রাজা তাদের কথা অগ্রাহ্য করে জ্যোতিষীর দিকে দেখেন—

রাজা : ওহে রাজজ্যোতিষী!

জ্যোতিষী গণনা থেকে মুখ তোলেন।

রাজা : কদ্দূর, তোমার গণনা?
জ্যোতিষী : শেষ, জাঁহাপনা।
রাজা : আগে বল, উদয়ন পড়বে কি ধরা?
জ্যোতিষী : সে সম্ভাবনা নিরানব্বুই ভাগ শতকরা।

রাজার মন নেচে ওঠে।

রাজা : বাঃ বাঃ বাঃ! আর কী বলে, গ্রহনক্ষত্র?
জ্যোতিষী : হীরকরাজ্যে সুখশান্তি সর্বত্র!
রাজা (গদগদ) : বটে?
জ্যোতিষী : উৎসবের পরেরদিন প্রত্যুষে আরম্ভ. তারপর —
রাজা : আর থাকবে কত দিন?
জ্যোতিষী : যতদিন , ততদিন!

রাজার মুখে আর হাসি ধরে না।

রাজা : বাঃ বাঃ বাঃ!
জ্যোতিষী : তবে ইয়ে—

নিমেষে সেই হাসি মিলিয়ে যায়।

রাজা : আবার সংশয় কী নিয়ে?

জ্যোতিষী তাঁর পঞ্জিকার দিকে দৃষ্টি দেন।

জ্যোতিষী : শনি, শুক্র, বুধ—এই তিন ঃ

রাজা চরম উদ্বিগ্নে এগিয়ে যান জ্যোতিষীর দিকে।

রাজা (কাঁপা গলায়) : কী? বিদ্রোহ? মহামারি? লোকক্ষয়?

জ্যোতিষী টিকি দুলিয়ে মাথা নাড়েন।

জ্যোতিষী : উঁহুঁহুঁহুঁহুঁ— তা নয় — তবে...

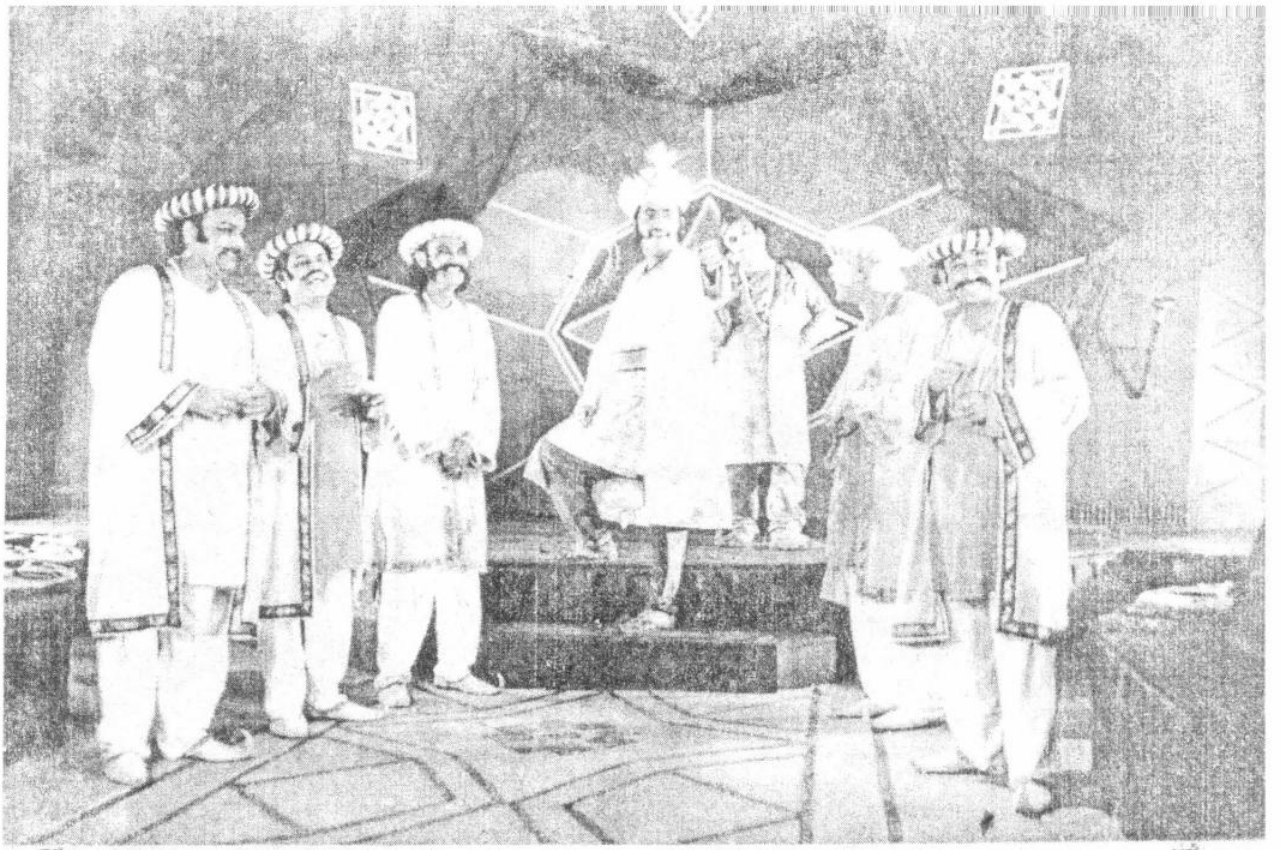

রাজা : তবে কী?

জ্যোতিষী গণনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সকলে চাপা উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করে। রাজার চরম অবস্থা।

রাজা : বলে ফেল—ভয় নাই!

জ্যোতিষী এবার মুখ তুলে রাজার দিকে চেয়ে হাসেন।

জ্যোতিষী : মগজ ধোলাই!

রাজা : সেইটাই ত চাই, কিন্তু কার?

জ্যোতিষী : হীরকের সবচেয়ে বড় শত্রু যে, তার!

রাজা এবার সত্যিই উল্লসিত।

রাজা : হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

মন্ত্রীরাও হেসে ওঠেন। রাজা খেলাচ্ছলে তাঁদের প্রত্যেকের পেটে একটি করে খোঁচা মেরে—

রাজা : অ্যাই! ভালো দেখে একখান হীরে, দাও জ্যোতিষীরে!

॥ ৭ ॥

হীরকের রাজপথ। উৎসবের দিন।

দেশ-বিদেশের নিমন্ত্রিত রাজারা সুসজ্জিত উট, হাতি চেপে চলেছেন রাজপথ দিয়ে তোরণের দিকে।

গুপী-বাঘাকে একটা হাতির পিঠে দেখা যায়, রাজ পোশাকে।

দূরে মাঠে লাল কাপড়ে ঢাকা রাজার মূর্তি দেখা যাচ্ছে। গুপী-বাঘার দৃষ্টি সেই দিকে যায়।

'স্বাগতম' লেখা তোরণের নিচ দিয়ে শোভাযাত্রা কেল্লার দিকে এগোয়।

চলবে

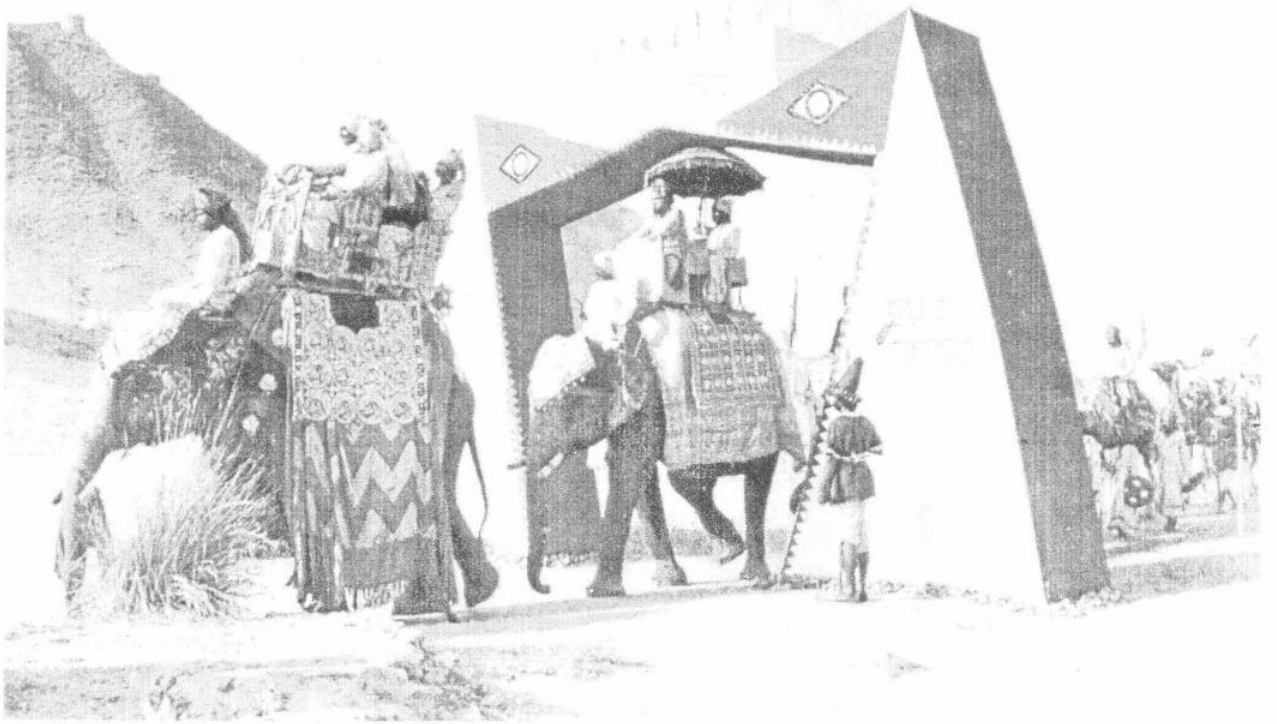

Good for health, Good to taste
Costs much less

A = Arambagh
B = Broiler
C = Chicken

ARAMBAGH
HATCHERIES LTD

59B,CHOWRINGHEE ROAD, CALCUTTA-700020

Regd. No. WB/SC-102 R.N.I. No. 12007/64 **SANDESH** November 1998 **Price Rs. 15.00**

What do Disney's Lion King, Spielberg's dinosaurs, Michael Jackson's videos and your father's office have in common?

Computers.

That machine which we call a computer, plays a big role in our lives. But the story doesn't end with the machine itself. What's more important is what makes it work. Which is known as software. Now, don't strain your mind over it. Software is nothing but the backbone of the many great things that we see around us. From show business to serious business, software has left a mark everywhere. TechnoCampus, the only software finishing school in Southeast Asia, trains people to develop such software.

So if you think you'll love to work on computers, visit TechnoCampus with your parents. Or even on your own. And someday, you could make Simba smile or a dinosaur dance. And better still, make your father happy.

TECHNOCAMPUS

The Software Finishing School

An institution from GLOBSYN

Trikaya Grey.Cal.GTL.63.98